প্রেমভক্তির অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে, রচনার চাতুর্য্যে ও পদাবলীর সৌকুমার্য্যে হিন্দি-রামায়ণ জগতে এক অপূর্ব্ব বস্তু. এই জন্য হিন্দিরামায়ণ-প্রণেতা তুলসীদাসকে হিন্দুস্থানের লোকেরা ভগবান্ বাল্মীকির অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এ বিষয়ে একটী প্রাচীন গাথা আছে, যথা ;—

"জনক ভূপতি নানকা শুকদেব ভএ কবীর,
বাল্মীকি তুলসী ভএ উদ্ধব সুর-শরীর॥
—জনক ভূপতি গুরু নানক-শরীর,
শুকদেব অবতীর্ণ হইয়া কবীর,
বাল্মীকি তুলসীরূপে জগতে প্রকাশ,
কৃষ্ণসখা উদ্ধব আপনি সুরদাস।"

সুবিখ্যাত মহাত্মা নাভাজী (১) স্বপ্রণীত "ভক্তমাল" গ্রন্থে তুলসীদাসকে বাল্মীকি বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন ;—

"ত্রেতা কাব্যনিবন্ধ করি শতকোটি রামায়ণ,
এক অক্ষর উদ্ধরে ব্রহ্মহত্যাদি পরায়ণ ;
অব ভক্তন সুখ দেন বহুরি লীলা বিস্তারী,
রামচরণ-রস-মত্ত রটত অহনিশি ব্রতধারী।
সংসার অপারকে পারকো, সুগমরূপ নৌকা লয়ো
কলিকুটিলজীব নিস্তারহিত বাল্মীকি তুলসী ভয়ো।"

ত্রেতাযুগে শতকোটি শ্লোকে রামায়ণ, (১)
বিরচিলা মহর্ষি বাল্মীকি তপোধন ;
এক এক বর্ণ তার এত গুণ ধরে,
শ্রুতিমাত্র ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ হরে ;
অহর্নিশ রামপদে মগ্ন মুনিবর,
ভক্ত সুখ তরে লীলা করিলা বিস্তর ;
করিবারে অনায়াসে ভবসিন্ধু পার ;
রামায়ণ-সুখসাধ্য তরণী তাহার ;
কলির কুটিল জীবে করিতে নিস্তার,
বাল্মীকি তুলসীরূপে ভবে অবতার।

বস্তুতঃ প্রেম-ভক্তির অবতার, কবিত্ব-প্রতিভার জলন্ত-মূর্ত্তি তুলসীকে সাক্ষাৎ বাল্মীকি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব স্বপ্রণীত "উপাসক-সম্প্রদায়ে" তুলসীদাসের রামায়ণকে বাল্মীকিরামায়ণের হিন্দি অনুবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; বস্তুতঃ উহা সংস্কৃত রামায়ণের ভাষান্তর নহে, উহা কাব্য-জগতে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি, প্রেম-ভক্তি ও প্রতিভার অভিনব উৎস। হিন্দুস্থানের যদি এক জন বাল্মীকিরামায়ণ পড়ে, তবে সে স্থলে শত সহস্র ভক্ত তুলসীর রামায়ণ পড়ে। তুলসীর রামায়ণই হিন্দুস্থানের নিত্য-পাঠ্য গীতা ভাগবত। কথিত আছে, তুলসীর অযোধ্যায় অবস্থানকালে, স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র হিন্দিভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে তুলসীদাসকে স্বপ্নে প্রত্যা-

(১) তুলসীদাস যখন দিল্লী হইতে বৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন নাভাজীর সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। নাভাজী তুলসীর প্রভাব দেখিয়া তাঁহাকে বাল্মীকির অবতার বলিয়াই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া এই শ্লোক রচনা করেন।

(১) এইরূপ প্রবাদ, বাল্মীকি শতকোটি শ্লোকে রামায়ণ রচনা করেন, এবং ঐ সকল শ্লোক নানা লোকে বন্টন করিয়া দেন। মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা বিষয়েও এইরূপ প্রবাদ।

দেশ করায়, তিনি সংবৎ ১৬৩১, চৈত্র শুক্লনবমীতে মঙ্গলবারে রামায়ণ রচনা আরম্ভ করেন।

"সংবৎ সোলহসৌ ইকতীশা,
করৌ কথা হরিপদ ধরি শীশা।
নৌমী ভৌমবার মধুমাসা,
অবধপুরী যহ চরিত প্রকাশা॥"

অর্থাৎ—সংবৎ ১৬৩১, চৈত্র, শুক্ল-নবমীতে, মঙ্গলবারে, অযোধ্যা নগরে, শ্রীহরির পাদপদ্ম শিরে ধারণপূর্ব্বক এই রামচরিত প্রকাশিত হইল। তখন তাঁহার বয়স চল্লিশের কিঞ্চিৎ অধিক।

তুলসীর রামায়ণ হিন্দিভাষায় রচিত হইতেছে জানিয়া বারাণসীর পণ্ডিতগণ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন,—ভগবৎ-কথা দেশী ভাষায় রচনা করা বাতুলতা। দেবচরিত্র দেবভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে রচিত না হইলে তাহা অগ্রাহ্য হয়। তুলসী ইহার উত্তরে, নিম্নলিখিত শ্লোকটী তাঁহাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন ;—

"হরিহরযশ সুরনরগিরা বর্ণহিং সন্ত সুজান।
হাংড়ী হাটক চারু চির রাংধৈ স্বাদ সমান॥"
—সংস্কৃত বা দেশী ভাষা যাহে চায় মন,
হরিহরকীর্ত্তি তাহে করহ কীর্ত্তন ;
ভাল চিড়া দুগ্ধে যদি রাঁধহ পায়স—
মৃৎপাত্রে বা স্বর্ণপাত্রে তাহা তুল্যরস।

অর্থাৎ ভাল চিড়া ও ভাল দুগ্ধ লইয়া, মাটির হাঁড়িতে পায়স রাঁধ, বা সোণার হাঁড়িতেই রাঁধ, তাহাতে স্বাদের তারতম্য হয় না। এমন সত্য, এমন সরল, স্বাভাবিক ও বিশদ দৃষ্টান্ত ও উপমা তুলসী-কবিতার প্রতি ছত্রে দীপ্যমান। বারাণসীর যে সকল পণ্ডিত, হিন্দিভাষায় রামায়ণ-রচনার জন্য তুলসীকে গালি দিয়াছিলেন, তাঁহারা এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া তুলসীকে ধন্যবাদ সহ এই শ্লোকটী উপহার দেন ;—

"পরমানন্দপত্রোঽয়ং জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতামঞ্জরী যস্য রামভ্রমরভূষিতঃ॥"
—জঙ্গম তুলসীতরু এ তুলসীদাস,
যাহাতে পরমানন্দ-পত্রের বিলাস ;
বিচিত্র কবিতাগুচ্ছ মঞ্জরী তাহার,
রাম-মধুকর যাহে করেন বিহার।

কথিত আছে, মধুসূদনাচার্য্য নামক জনৈক দণ্ডী পূর্ব্বোক্ত শ্লোক উপহার লইয়া স্বয়ং তুলসীদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে পণ্ডিতসমাজের আন্তরিক ধন্যবাদ সহ উহা দান করিয়াছিলেন, এবং তুলসীকে প্রথমে তাঁহারা নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া বারবার তাঁহার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

একদা এক নরঘাতক মহাপাপী রামনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা মাগিতে মাগিতে কাশীধামে উপস্থিত হয়। তুলসীদাস উহাকে স্নান করাইয়া, আপন পার্শ্বে বসাইয়া ভোজন করাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা সভা করিয়া তথায় তুলসীকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন,—এ মহাপাপীর পাপক্ষয় কিরূপে হইল? আপনি ইহাকে পার্শ্বে বসাইয়া ভোজন করাইলেন কেন? তুলসী কহিলেন,—তোমরা যে সকল পুথি পড়িয়াছ, সে সকল ছিন্ন করিয়া ধূলায় নিক্ষেপ কর,

হায়! হায়! তোমরা রামনামের মাহাত্ম্য পড়িয়াও জানিতে পার নাই; রামনামের প্রভাবে ইহার পাপক্ষয় হইয়াছে। পণ্ডিতেরা কহিলেন,—বিশ্বেশ্বরের এই পাষাণনির্ম্মিত বৃষ যদি ইহার হস্তের প্রসাদ ভোজন করে, তবে ইহার পাপক্ষয় বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস হয়। তখন তুলসীদাস প্রসাদ প্রস্তুত করিয়া ঐ পাপীর হস্তে দিয়া সকলের সঙ্গে মন্দিরে গমন করিলেন, এবং পাপীকে ঐ প্রসাদ পাষাণ-বৃষের মুখে দিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি প্রসাদ বৃষের মুখে ধরিবামাত্র, বৃষ মুখ ব্যাদান করিয়া তাহা ভোজন করিল। ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে সকলে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন ব্রাহ্মণেরা লজ্জিত হইয়া তুলসীর পদতলে পতিত হইলেন।

কাশীধামে একদা শাস্ত্রার্থ লইয়া বৈষ্ণবে ও যোগিগণে বিবাদ বাঁধিয়াছিল। বিচারে যোগিগণের পরাজয় হওয়ায়, যোগিসম্প্রদায়ের গুরু নিজ শিষ্য পরাক্রান্ত সুবাদার দ্বারা বৈষ্ণবগণের কণ্ঠী (মালা) হরণ করাইলেন। সুবাদারের লোকেরা শেষে তুলসীর কণ্ঠী হরণ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখীন হইবামাত্র তাহাদের চরণ অসাড় হইয়া পড়িল। গতিশক্তি রোধ হওয়ায় তাহারা চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। স্বয়ং সুবাদারও তন্মধ্যে ছিলেন। তাহারা তখন সকলেই দেখিল,—তথায় সে তুলসী-মূর্ত্তি নাই, তৎপরিবর্ত্তে যমকিঙ্কর সদৃশ এক ভয়ঙ্কর পুরুষ মুদ্গরহস্তে আরক্ত-লোচনে তাহাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত। তখন তাহারা ত্রাহি ত্রাহি শব্দে তুলসীর চরণে শরণাপন্ন হইল। তুলসী তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং অপহৃত কণ্ঠীগুলি বৈষ্ণবদিগকে প্রত্যর্পণ করাইলেন।

একদা এক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হওয়ায়, তদীয় পত্নী সতী হইবার জন্য শবদেহের সঙ্গে গঙ্গাতীরে যাইতেছিলেন। তিনি পথিমধ্যে তুলসীদাসকে দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। তৎক্ষণাৎ তুলসীর মুখ হইতে,--"তুমি পতিসৌভাগ্য-বতী হও" এই আশীর্ব্বাদ বহির্গত হইল। এ কথা শুনিয়া মৃতের ভাইবন্ধুরা বলিলেন,—"ঠাকুর! ইনি ত আজি বিধবা হইয়াছেন, ইঁহার পতির শবদেহ সৎকারার্থ গঙ্গাতীরে নীত হইতেছে, ইনিও সতী হইতে চলিয়াছেন। অতএব আপনার এ আশীর্ব্বাদ কিরূপে ফলিবে?" তুলসী কহিলেন,—"এখন ইহার অগ্নিসংস্কার করিও না। আমি একটু বিলম্বে আসিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন এবং গঙ্গাস্নান করিয়া ভগবান্ রামচন্দ্রের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই ঐ মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ করিল। বোধ হইল যেন সে গভীর নিদ্রা হইতে জাগরিত হইল। সে উঠিয়াই রামনাম করিতে করিতে দ্রুতপদে গিয়া তুলসীর পদতলে পতিত হইল। তখন সমবেত জনমণ্ডলী হইতে "জয় রাম জয় রাম" ধ্বনি উত্থিত হইল। সকলে গিয়া তুলসীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

একদিন কাশীধামে মাঘমাসের দারুণ শীতে অতি প্রত্যূষে তিনি গঙ্গায় আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া জপ করিতেছেন, এক বেশ্যা ইহা দেখিয়া বলিল,—অহো! এ ব্রাহ্মণের নিজ শরীরে বিন্দুমাত্র মমতা নাই। তুলসী সে কথা শুনিলেন। অনন্তর তিনি জল হইতে উঠিয়া, নিজ শুষ্ক বস্ত্রে গঙ্গাজল ছিটাইয়া তাহা পরিধান করিলেন। জল ছিটাইবার সময় এক ছিটা জল সেই বেশ্যার গাত্রে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ বেশ্যার মায়ামোহ দূর হইল, সে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, যমযাতনা, ব্যভিচারাদি পাপের ফলস্বরূপ বিবিধ নরক, প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিল। অনন্তর সে ভয়বিহ্বলচিত্তে তুলসীর শরণাপন্না হইয়া সমস্ত বিষয়বাসনা পরিহার পূর্ব্বক, তুলসীর নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষিতা হইল। নিজ পাপকর্ম্মে উপার্জ্জিত সমস্ত ধন দীন-সেবায় অর্পণ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইল। কথিতও আছে,—

"সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতাহি সাধবঃ।
কালে ফলন্তি তীর্থানি সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥"
—সাধুর দর্শনমাত্রে পুণ্যলাভ হয়,
তীর্থের অধিক সাধু জানিবে নিশ্চয়;
ফলিতে তীর্থের ফল বিলম্ব হইবে,
সাধুদর্শনের ফল সদ্যই ফলিবে।

তুলসীর জীবনে এরূপ এবং ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্যতর অসংখ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। ফলতঃ তাঁহার এমনি মোহিনী শক্তি, যে, তিনি যখন যে স্থানে থাকিতেন, তাঁহার প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া শতশত নরনারী তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইত। তাঁহার দর্শনমাত্রেই লোকের শোকতাপ দূরে যাইত, এবং হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইত। তাঁহার এক একটী কথা, মৃতসঞ্জীবনী সুধার ন্যায় লোকের নবজীবন সঞ্চার করে। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় ও বদন অচিন্ত্যশক্তি শব্দব্রহ্মের লীলাভূমি। প্রবলপ্রতাপ যবনসম্রাটের অধিকারে তাঁহার অভ্যুদয়। যবনেরা তাঁহার উপর লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিল। তিনি প্রহ্লাদের ন্যায় একমাত্র ধর্ম্মবলে সে সকল সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

তুলসীর জন্ম ও কর্ম্ম সকলি অদ্ভুত। তুলসীদাস বান্দাজেলায় রাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাকে কেহ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ কেহ বা সরযূপারী ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার জন্মসংবৎসর কোনও মতে ১৫৮৯, কোনও মতে ১৫৮৩। অতএব তিনি প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তুলসীর পিতার নাম আত্মারাম দ্বিবেদী, গোত্র পারাশর। তুলসী মূলনক্ষত্রের প্রথম চরণে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় তদীয় পিতামাতা তৎক্ষণাৎ সেই সদ্যোজাত শিশুকে পরিত্যাগ করেন। মুহূর্ত্তচিন্তামণি নামক জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে;—

"অথোচুরন্তে প্রথমাষ্টঘ:টা
মূলস্য শাক্রান্তিমপঞ্চনাড্যঃ।
জাতং শিশুং তত্র পরিত্যজেদ্ বা
মুখং পিতাস্যাষ্টসমা ন পশ্যেৎ॥"

অর্থাৎ—মূলনক্ষত্রের প্রথম আট ঘটিকা

এবং জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের অন্তিম তের ঘটিকাকে 'অভুক্ত মূল' বলে। এ সময় যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, পিতামাতা সেই শিশুকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে, অথবা ৮ বর্ষ উহার মুখদর্শন করিবে না। এই জন্তই তুলসী স্বকৃত বিনয়পত্রিকায় লিখিয়াছেন;—

"জননি জনক তজ্যো জনমি করম বিধি হুঁ স্থজ্যো অবডেরে"—অর্থাৎ আমার জন্মমাত্রেই পিতামাতা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন; বিধাতা আমাকে ভাগ্যহীন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। নৃসিংহদাস নামক এক সাধু সেই সদ্যোজাত শিশুকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া দয়ার্দ্রহৃদয়ে তাহাকে লইয়া শূকরক্ষেত্র নামক স্থানে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন, এবং পরম যত্নে উহার লালনপালন করিতে লাগিলেন। উক্ত সাধু অতিশয় রামভক্ত ছিলেন, তদীয় সহবাসে শৈশবেই তুলসীর রামভক্তির সঞ্চার হয়। শিশুকে তিনি নিজ শিষ্য করিয়া সমগ্র রামায়ণ পড়াইলেন। তুলসী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, দীনবন্ধু পাঠক নামে কোনও মহাত্মা তুলসীকে রামভক্ত, সৎকুলোদ্ভব ও সচ্চরিত্র জানিয়া, নিজ সুন্দরী কন্তা রত্নাবলীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। তুলসী ঐ কন্তার রূপলাবণ্যে এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, নিমেষমাত্র তাহার অদর্শন সহিতে পারিতেন না। কন্যার পিতা কন্যাকে নিজগৃহে আনিবার জন্ত বারংবার লোক পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু তুলসী কিছুতেই পত্নীকে যাইতে দিলেন না। অনন্তর কন্তার ভ্রাতা আসিয়া ভগিনীকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর পীড়াপীড়ি করিয়াও যখন অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন একদিন তুলসী বাজারে দ্রব্যাদি কিনিতে গিয়াছেন, এই সুযোগে তাঁহার শ্যালক আসিয়া ভগিনীকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। তুলসী গৃহে আসিয়া স্ত্রীকে না দেখিয়া আকুল হইলেন। তাঁহার শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। অনন্তর: উন্মত্তের ন্যায় সুদূর শ্বশুরালয়ে ছুটিলেন। তাঁহার স্ত্রী সবেমাত্র পিত্রালয়ে পদার্পণ করিয়াছেন, তখনও পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণামাদি করেন নাই, এমন সময় স্বামীকে তথায় উন্মত্তবৎ উপস্থিত দেখিয়া ক্রোধে ও লজ্জায় অধীর হইলেন, এবং তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—নাথ! আমার এই অস্থিচর্ম্মময়, মলমূত্রাধার দেহে তোমার যে আসক্তি, এ আসক্তি যদি ভগবান্ রামচন্দ্রে হইত, তবে কি সৌভাগ্যই লাভ করিতে! তুমি আমার যে-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, তাহা ভৌতিক, অনিত্য ও জ্বালাময়; কিন্তু ভগবানের সৌন্দর্য্য দিব্য, জ্যোতির্ম্ময়, নিত্য ও আনন্দময়"।

তুলসীপত্নীর উক্তিবিষয়ে নিম্নলিখিত গাথা প্রচলিত আছে:—

"লাজ না লাগত আপকো, দৌরে আয়হু সাথ।
ধিক্ ধিক্ ঐসে প্রেমকো, কহা কহহুঁ মৈং নাথ!
অস্থিচর্ম্মময় দেহ মম তাসোং জৈসী প্রীতি।
তৈসী জো শ্রীরামমেং হোত, নতৌ ভবভীতি॥

—ছাড় লজ্জা তেয়াগিয়ে
ছি ছি নাথ ! এসে ধেয়ে,
অস্থি চর্ম্ম দেহে মোর যে তৃষ্ণা তোমার ;
শ্রীরামে সঁপিলে তাহা
কি সৌভাগ্য হ'ত আহা !
অনায়াসে তরে যেতে ভব-পারাবার।

অহো ! কি শুভযোগেই তুলসীপত্নীর মুখে ঐ কথা বাহির হইল ! প্রিয়তমার ঐ কয়টী কথায়, অশনিপাতে গিরিচূড়ার ন্যায় তুলসীর বজ্রকঠিন মোহাবরণ চূর্ণ হইয়া গেল। ভগবান্ দেখিলেন,—ইহার এ তৃষ্ণার, এ আসক্তির গতি ফিরিলে কোটি কোটি পাতকীর পরিত্রাণ হইবে, জীবলোকের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। মঙ্গলময় কখন কি অভিপ্রায়ে কোন্ আধারে কি উপলক্ষ্যে কি ঘটনা ঘটান, তাহা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবের বুদ্ধির অতীত। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে হৃদয়ে, তপ্তকটাহে পিপিড়পিণ্ডের ন্যায় অনন্ত কামনাসকল ফুটিতেছিল, নিমেষমাত্রেই সে হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া গভীর বৈরাগ্য প্রবেশ করিল, সকলি শীতল হইয়া গেল। অহরহ চক্ষের উপর দেখিতেছি,—

"ক্বচিদ্ বাদিত্রনৃত্যাদি সেব্যতে মুদিতৈ-
র্জনৈঃ।
ক্বচিত্তে চাপরৈরার্ত্তৈর্ধারাশ্রুনয়নাননৈঃ॥"

অর্থাৎ—কোনও গৃহে উৎসবমগ্ন জনমণ্ডলীর গীত-বাদ্য-নৃত্যাদির হর্ষধ্বনি, আবার ঠিক্ সেই সময় অপরগৃহে অশ্রুপ্লাবিত শোকার্ত্তগণের গগনভেদী হাহারব ! সুখ দুঃখের এই আলোক ছায়ার সাংসারিক বস্তুমাত্রই আক্রান্ত। এই ছিল, এই নাই ; হৃদয়ে জ্বালাময়ী স্মৃতিমাত্র রাখিয়া সকলি চলিয়া যায়। আজি কোথা সেই পিতা-মাতা ? কোথা সেই ভাই-ভগিনী ? কোথা সেই বাল্যবন্ধু ? সে সময় ভাবিতাম,—এ সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিবে না, এ জীবন এইরূপ উৎসবেই কাটিবে। কিন্তু হা অনিত্যতা ! তুমি প্রাণপোষিণী স্মৃতিমাত্র রাখিয়া সকলি হরণ করিয়াছ, সকলি হরণ করিয়াছ, এখন কেবল অনুতাপ ও অশ্রুপাত। যাঁহারা সময় থাকিতে এই অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সহস্র বিঘ্ন বাধা পায়ে ঠেলিয়া শাশ্বত মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান্। যাঁহারা মনে করেন,—সংসারের এই উপস্থিত কার্য্যটী শেষ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইব এবং তখন ভগবৎপ্রসঙ্গে মনোনিবেশ করিব, তাঁহারা কি ভ্রান্ত !

"সমাপ্য বিষয়ান্ সর্ব্বান্ যো হরিং স্মর্ত্তু-
মিচ্ছতি।
সমুদ্রে শান্তকল্লোলে স মূঢ়ঃ স্নাতুমিচ্ছতি॥"

—সংসারের সব কার্য্য করি' সমাপন,
যে জন করিতে চায় হরিকে স্মরণ ;
তীরে সিন্ধু-তরঙ্গের হেলে অবসান,
সে মূঢ় করিতে চায় সিন্ধুজলে স্নান।

তরঙ্গও থামে না। স্নান করাও হয় না।

এই ভব-সমুদ্রে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, পর্ব্বতাকার তরঙ্গ, হুড়পাড় করিয়া আস্ফালন করিতে করিতে আসিতেছে,

দিবারাত্রি ক্ষণমাত্র বিরাম নাই। দৃষ্টিকে তরঙ্গের দিকে না দিয়া ঈশ্বরের দিকে ফিরাও, অজেয় শক্তি লাভ করিবে। তুলসী গৃহত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন, সঙ্গে কপর্দ্দকও লইলেন না। কৃপাসাগর রামচন্দ্রের দর্শনলালসা, সন্নিপাতবিকারের তৃষ্ণার ন্যায় তাঁহার অন্তরে জ্বলিতে লাগিল। যিনি অহল্যাপাষাণীর উদ্ধারকর্ত্তা, শ্রমণাচণ্ডালীর মুক্তিদাতা, গুহকচণ্ডালের সখা; বনের ঋক্ষবানরগণও যাঁহার প্রেমালিঙ্গনের অধিকারী; যাঁহার নামের গুণে ঘোর দস্যুও অমরপূজিত বাল্মীকি হইয়াছিলেন, সেই পতিতপাবন রামচন্দ্র এ চণ্ডালেও কৃপা করিবেন, তিনি এই আশায় বুক বাঁধিলেন।

(ক্রমশঃ)

বিষয় মোহের পরিণাম।

"শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ পঞ্চত্বমাপুঃ
স্বগুণেন বদ্ধাঃ।
কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গমীনভৃঙ্গা নরঃ পঞ্চ-
ভিরঞ্চিতঃ কিম্॥

শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ—পঞ্চগুণ
একে একে পঞ্চ জীবে করে তারা খুন।
কুরঙ্গ, পতঙ্গ, মীন, ভৃঙ্গ ও বারণ,
স্ব স্ব গুণে বদ্ধ হয়ে হারায় জীবন।
বংশীরবে মুগ্ধ মৃগ মরে ব্যাধ-শরে,
পতঙ্গ রূপের মোহে হুতাশনে মরে।
আমিষে লোলুপ মীন নিহত বড়িশে,
গন্ধে অন্ধ অলি মরে কেতকীর পাশে।
করিণীর স্পর্শ-সুখে করী ত্যজে প্রাণ,
এক এক গুণে করে সব ফল দান।
একাধারে পঞ্চ গুণে অনুরক্ত নর,
তরিতে কি পারে কভু সংসার-সাগর!

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী

আমরা কি চাই।

(২)

বাঁচিতে হইলে আমাদের যাহা যাহা চাই তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। এখন আমাদের নিজেদের প্রধান প্রধান যে কয়টা অভাব আছে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

প্রথম অভাব—নৈতিক সাহসের। অনেক জিনিষ ভাল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু নূতন বলিয়া আমরা তাহা করিতে সাহস করি না। অনেক প্রথা আমাদের আছে, যাহা সমাজের জীবনীশক্তিকে দিন দিন ক্ষীণ করিতেছে। বক্তৃতায় বা কাগজে কলমে আমরা তাহাদিগকে অনেকবার বৈতরণী পার করিয়া দিয়া আসি, কিন্তু কাজের বেলা প্রায়ই পশ্চাৎপদ হই। আবশ্যক

হইলে পুরাতন প্রথা বর্জ্জন ও নূতন প্রথা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা আজও আমাদের জন্মায় নাই। জাপানের দৃষ্টান্ত এ সম্বন্ধে জলন্ত, কিন্তু আমাদের জীবন্ত রক্ষণশীলতার কাছে তাহা নিষ্প্রভ। দেখিয়াও আমরা দেখি না, শুনিয়াও শুনি না, পড়িয়া আছি অসাড় মৃত প্রায়। নৈতিক সাহস যতদিন না আমাদের মনে বলবৎ হইবে, ততদিন আমরা নিজেদের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা কিছু করিতে পারিব না। অত্যাবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন সম্পাদন করিতে যদি সাহসে না কুলায়, তাহা হইলে বর্ত্তমানকালের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় ও কঠোর জীবনসংগ্রামে আমাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইবেই।

দ্বিতীয় অভাব—আত্মনির্ভরতার। ইহা আমাদের নাই বলিলেই হয়। সকল বিষয়েই আমরা পরমুখাপেক্ষী। ইহা বহুকাল হইতে পরপদানত থাকার অন্যতম ফল। অনেক দিন হইতে নিজেদের অনেক কাজ আমরা নিজে করি নাই, বিদেশীয় রাজার উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছি। কাজে কাজেই নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবার অভ্যাস আমরা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটী সহজে বুঝা যাইবে। গাঁয়ে বড় জলকষ্ট। সকলেই বেশ অনুভব করিতেছি। কিন্তু কষ্ট সহ্য করিতেছি মুখ বুজিয়া। জোর কোন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে সম্মুখে পাইলে, যদি ভরসা কুলায়, দুঃখের কথা তাঁহাকে জানাইতেছি, বা জেলা বোর্ডে বা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে পাঠাইবার জন্য দরখাস্তে সই করিতেছি। কিন্তু গাঁয়ের পাঁচ জনে মিলিয়া কিছু চাঁদা তুলিয়া একটা কুয়া যে আমরা নিজে কাটাইয়া লইতে পারি, এ কথা কাহারও মনে উঠে না। একটা কথা আমরা ভাবি না— নিজের কাজ নিজে যেমন করিতে পারা যায়, অন্যে তাহা পারে না। আমার হাঁটা অন্যে হাঁটিয়া দিলে হয় না।

তৃতীয় অভাব—উদ্যোগিতার। আমরা হইতেছি গড্ডলিকা-প্রবাহ, নূতন কাজ করিতে পারি না ও চাই না। কাহাকে সাহস করিয়া নূতন কিছু করিতে দেখিলে, আমরা কত ভীত হই বা তাহাকে বিদ্রূপ করি। আমাদের মধ্যে কথাই আছে, "ডাংপিটের মরণ গাছের আগায়"। তৃতীয় ভাগের "গোপাল"ই আমাদের আদর্শ চরিত্র। কিন্তু এখন কতকগুলি "রাখালের" দরকার হইয়া পড়িয়াছে। যাহা স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষেরা কল্পনায় আনিতেও বোধ হয় অক্ষম ছিলেন, এমন অনেক কাজ করা এখন আমাদের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে ভরসা ও উদ্যোগিতা কোথায়? সাগর লঙ্ঘিবার ও গিরি ডিঙ্গাইবার লোক চাই, এবং তাহা বেশী পরিমাণে। জলে জঙ্গলে থাকার লোক চাই, এবং তাহা বেশী পরিমাণে। যদি না পাওয়া যায়, আমাদের কোন আশা নাই।

চতুর্থ অভাব—স্বাধীনভাবে কাজ করার

অনভ্যাস হেতু মৌলিকতার। উদ্ভাবনী শক্তি আমাদের একপ্রকার লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানের এক মূল সূত্র হইতেছে,—যে অঙ্গের চালনা না হইবে, তাহা ক্রমে শুষ্ক হইয়া গিয়া লোপ পাইবে। এ নিয়ম কেবল শারীরিক অঙ্গের প্রতি খাটে তাহা নয়, মানসিক বৃত্তির প্রতিও খাটে। বহুকাল হইতে স্বাধীনভাবে কাজ করার অভ্যাস আমাদের গিয়াছে। উপরওয়ালাদের হুকুম তামিল করাই মুসলমান আমল হইতে প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চিন্তা করেন উপরওয়ালারা, তাঁদের আজ্ঞা প্রতিপালন করেন তাঁবেদারেরা। অধিক দিন তাঁবেদারি করিলে চিন্তাশক্তির হ্রাস হইয়া আসে এবং মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমাদের তাহাই হইয়াছে। নূতন কিছুই আমরা উদ্ভাবন করিতে পারি না, বুদ্ধি খরচ করা ভুলিয়া গিয়াছি। পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণ করা সহজ এবং তাহাকেই আমরা ধর্ম্মের স্থানে দাঁড় করাইয়াছি।

পঞ্চম অভাব—একতার। পাঁচ জনে মিলিয়া কাজ করিতে আমরা জানি না। এরূপ কাজ করিবার অক্ষমতা আমাদের একপ্রকার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। জাতিভেদ প্রথা ইহার অন্যতম মূল কারণ বলিয়া অনুভূত হয়। জাতিভেদ বহুকাল হইতে দেশে আছে, এবং পুরাকালে ভিন্ন ভিন্ন জাতির কাজ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এই প্রথা একতার যে কতদূর প্রতিকূল তাহা "বার রাজপুত তের হাঁড়ী" এই প্রবচনেই প্রকাশ। সকলেই নিজে নিজের হাঁড়ী লইয়া ব্যস্ত, এক হইয়া কাজ করিবে কখন? সকলেই নিজের বা জোর নিজ জাতির ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, মিলিয়া মিশিয়া সাধারণের কাজ কিছু করিবার সময় পাইবে কিরূপে? একেত জাতিভেদ চিরন্তন প্রথা, তাহার উপর মুসলমান আমল হইতে ধর্ম্মভেদ আসিয়া জুটিয়াছে। পূর্ব্বে যে ইহা ছিল না তাহা নয়। হিন্দুর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও পরস্পরের প্রতিকূলাচরণ বরাবরই আছে, এবং হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে বৈরিতা বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে এক প্রকার তাড়িত এবং বিভিন্ন মতাবলম্বীদের দ্বেষ ও শত্রুতা কখন খুব বেশী দূর গড়ায় নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ গুরুতর, এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। অনেক দিন একত্র থাকা নিবন্ধন উভয়ের মধ্যে কতকটা ঔদার্য্য যে জন্মায় নাই তাহা বলা যায় না; কিন্তু যাহাদের মধ্যে গোঁড়ামি প্রবল, তাহাদের পক্ষে উদারতা অবলম্বন করা একপ্রকার অসম্ভব; এবং হিন্দু মুসলমানের ভিতর এরূপ লোকের অভাব নাই। সুবিধা পাইলেই তাহারা পরস্পরের প্রতি ঘৃণা দেখাইতে কৃপণতা করে না। গোঁড়া হিন্দুর কাছে মুসলমান অস্পৃশ্য "নেড়ে" এবং গোঁড়া মুসলমানের কাছে হিন্দু ঘৃণার্হ "কাফের" বই আর কিছু নয়।

হিন্দুর মধ্যে ছত্রিশ জাতি, হিন্দু মুসলমানও অনেক দিন হইতে আছে। উপরন্তু আবার এখন খৃষ্টান আসিয়া জুটিয়াছে। সাধারণ খৃষ্টীয় প্রচারকের হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মকে গালি দেওয়া এক প্রধান কাজ। যেখানে তাহাদের গতিবিধি আছে, সেখানে ধর্ম্মবিদ্বেষবহ্নি অন্য স্থান অপেক্ষা একটু বেশী করিয়া জ্বলিয়া থাকে।

প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায় ছাড়া দেশে ক্ষুদ্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ও আছে। অনেক হিন্দু আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মদের উপর খড়্গহস্ত। এবং ব্রাহ্মদের মধ্যে যে হিন্দুর প্রতি বিরাগ একেবারে নাই তাহা বলা যায় না। যেখানে মানুষ আছে, সেখানে দলাদলি একরূপ স্বাভাবিক নিয়ম। ইহার উপর এই দুর্ভাগা দেশে এত কারণ জুটিয়াছে যে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিবাদ বিসম্বাদ আরও বেশী হয় না, ইহা অনেক সময় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। দেশে একতার অভাব একরূপ সংক্ষেপতঃ বিবৃত হইল এবং ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিবারও কিয়ৎপরিমাণে চেষ্টা করা গেল।

ষষ্ঠ অভাব—অধিনায়কের অধীনে কার্য্য করিবার ক্ষমতার। ইহা একতার অভাবের এক ফল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। "ক্ষমা ঘৃণা" আমাদের মধ্যে বড় কম। ঠিক আমার মতটী অপর সকলে গ্রহণ করিলেন না বলিয়া যদি আমার তাঁদের সঙ্গে একত্রে কাজ করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজ চলা ভার। পাঁচ জনে মিলিয়া কাজ করিতে হইলে ত্যাগস্বীকার ও ক্ষমা ঘৃণা চাই। কার্য্যকালে যে মতটা গ্রহণ করা হয়, তাহা প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মত হইতে পারে না। অনেক সময় উহা প্রধান প্রধান মতের ফল মাত্র। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক মহৎ দোষ এই যে, ইহার মধ্যে অনেকে স্ব স্ব প্রধান হইতে চান। এক জনের অধিনায়কত্ব স্বীকার করা তাঁহারা অমর্যাদার বিষয় মনে করেন। সকলেই "প্রথম" হইবার জন্য লালায়িত, "দ্বিতীয়" হইবার মাধুর্য্য কেহ বুঝিতে পারেন না। "সকলে বিক্রেতা,;হাটে ক্রেতা কেহ নাই।" ফল এই দাঁড়াইয়াছে, দল বাঁধিয়া কাজ করা আমাদের হয় না। আজ অনেক চেষ্টা করিয়া একটী দল গঠন করা হইল। কাল দেখিতে পাইবে,—ইহার ভিতর দলাদলি প্রবেশ করিয়াছে। "ক" বলিতেছেন "খ"-এর অধীন হইয়া কাজ করা আমার হইতে পারে না। কিসে আমি তাঁর অপেক্ষা ন্যূন? তিনি কেন আমার অধীন হইয়া কাজ করুন না? "গ" বলিতেছেন, আমাকে যদি নেতা কর ভালই, নতুবা আমি চলিলাম। হিন্দু মুসলমানের নেতৃত্ব স্বীকার করিবেন না, এবং হিন্দু নেতার অধীনে কাজ করা মুসলমান কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। অবস্থা যাহা বর্ণন করিলাম, তাহা প্রকৃত কিনা পাঠক পাঠিকারা বিচার করিয়া দেখুন।

সপ্তম অভাব—বিশ্বাসের। এটীও আমাদের মূলগত অনৈক্যের অন্যতম ফল

বলিয়া মনে হয়। পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে আমরা জানি না। কতকটা কারণ আমাদের সাধুতার অভাব। মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা কতকটা আমাদের অনভ্যস্ত হওয়ায়, উহা হইতে যে যে গুণ জন্মে, তাহা আমাদের মধ্যে জন্মায় নাই। ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা আমাদের ভিতর বড় প্রবল। নিঃস্বার্থভাবে যে কাজ করা যায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। লোকের সকল কাজের মূলে স্বার্থ থাকিবে, ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। এক জন লোক মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হইবার চেষ্টা করিতেছেন। সংবাদ পাইলেই আমরা আলোচনা করিতে বসি,—তাঁর যথার্থ উদ্দেশ্য কি? সকলেই বলি,—"ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াইবে" লোকটা কখনও এত বোকা হইতে পারে না। এরূপ অবিশ্বাস যে কেবল অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে আবদ্ধ তাহা নহে। শিক্ষিত দলের মধ্যেও ইহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন বঙ্গলক্ষ্মী মিল কিনিবার কথা উঠিয়াছিল, তখন একজন কংগ্রেস ও স্বদেশী-ভক্ত উকীলের সঙ্গে আমার ঐ সম্বন্ধে কথা হয়। প্রথমেই বলা দরকার যে, লোকটী বড় ভাল এবং সত্য সত্যই দেশের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে। তাঁহাকে আমি বলিলাম,—"স্বদেশহিতৈষিতার খাতিরে নিদান দুই এক খান অংশ কিনুন না।" তিনি বলিলেন, "দেখুন রক্ত-উঠা কড়ি, না দেখিয়া শুনিয়া যাহাতে তাহাতে ব্যয় করা যায় না। দৃষ্টান্তটী উকীলবাবুর উপর কটাক্ষ করিবার জন্য দিলাম না; আমাদের পরস্পরকে বিশ্বাস করিবার অক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য দিলাম। উপরে বলিয়াছি,—এরূপ হইবার কতকটা কারণ আমাদের সাধুতার অভাব। দুই চারি জায়গায় বিশ্বাস করিয়া লোকে ঠকিয়াছে, কাজেই সহজে আর বিশ্বাস করিতে চাহে না।

বেহুলা।

(কাব্যাংশ)

ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস বিরচিত "মনসা-মঙ্গলের" নায়িকা বেহুলা। বেহুলা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নিছনী গ্রামের সায়বেণে নামক বণিকের কন্যা। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে বা বাল্যজীবনে কোন অমানুষী ঘটনার উল্লেখ নাই। বেহুলার বাল্যকাল সাধারণ বালিকার ন্যায় অতিবাহিত হয়। ক্রমে তাঁহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিবাহ-কাল উপস্থিত হইলে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চম্পক—সাধারণতঃ চাম্পাইনগর—নামে প্রসিদ্ধ কোন গ্রামে চাঁদ সদাগরের সাত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ লখিন্দরের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হয়। চাঁদ সদাগর একজন সুপ্রসিদ্ধ বণিক্, ধনে, মানে,

কুলে, শীলে, তিনি গন্ধবণিক্‌জাতীয়দিগের অগ্রগণ্য—চাঁদ পরম শৈব। চাম্পাই নগরে এখনও তাঁহার পূজিত দুইটী শিলাময় শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, আকারে এরূপ প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই দুইটী শিবমূর্ত্তি লইয়া চাঁদ সদাগর প্রতিদিন দামোদর নদে স্নান করিতে যাইতেন। চাম্পাই নগর দামোদর নদের তীরবর্ত্তী। চাঁদ সদাগর বড়ই মনসাদ্বেষী ছিলেন, তিনি আপনিতো মুখে মনসার নাম করিতেন না—অবজ্ঞা করিয়া "চ্যাং মুড়ী কাণী" বলিতেন, অন্যকেও তাঁহার পূজা করিতে দিতেন না। চাঁদের পত্নী সনকা সর্পাধিষ্ঠাত্রী মনসা দেবীকে বড়ই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, স্বামীকে লুকাইয়া তাঁহার পূজার্চ্চনা করিতে ছাড়িতেন না, দৈবাৎ চাঁদ তাহা জানিতে পারিলে তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করিতেন। মনসার প্রতি চাঁদ দেবে ঈদৃশ বৈরভাব পোষণ করিতেন বলিয়া মনসা দেবীও তাহার প্রতিশোধ লইতে ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি চাঁদের ছয়খানি বোঝাই সমেত সওদাগরী নৌকা নদীতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন, চাঁদের সাত পুত্রের মধ্যে ছয়টীকে সর্পদংশনে শমনসদনে পাঠাইয়াছিলেন, ইহাতেও চাঁদ মনসার প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই, তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ খড়্গহস্তই ছিলেন। নখিন্দরের বিবাহ বেহুলার সহিত স্থির হইলে মনসা দেবী বেহুলাকে ছলনা করিবার জন্ত বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে সায়বেণের পুষ্করিণীতে উপস্থিত হয়েন। সায়-দুহিতা বেহুলা স্নান করিবার উপলক্ষে বালচাপল্য বশতঃ সন্তরণ দিতে দিতে দৈবাৎ ব্রাহ্মণীর গাত্রে তাঁহার পাদোদক স্পর্শ করে। ব্রাহ্মণী ছুত্র অনুসন্ধান করিতেছিলেন, ইহা অপেক্ষা আর কি সুযোগ পাইবেন, তাহা লইয়া বেহুলার সহিত বিতণ্ডা উপস্থিত করিলেন—অবশেষে তাঁহাকে নিদারুণ অভিশাপ দিলেন যে, বেহুলা প্রথম পতিসহবাস-রাত্রিতেই বিধবা হইবে। সর্পদংশনে তাঁহার স্বামীর প্রাণ যাইবে। ইহার অন্যথা হইবার নহে। বেহুলা তখন বুঝিলেন যে, মনসা দেবী তাঁহাকে ছলনা করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। তাহা না হইলে প্রতিদিনই স্নান করে, সন্তরণ দেয়—কই, অন্য দিনতো এমন দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

পুত্রের বিবাহবার্ত্তা শুনিয়া চাঁদ-নিতম্বিনী সনকা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি স্বামীকে নির্ব্বন্ধ সহকারে মনসার কোপশান্তির যুক্তি দিলেন। স্বামী তাহাতে সমধিক রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। মানুষ হইয়া দেবতার সহিত বাদ করিলে পরিণামে যে অশেষ দুঃখ পাইতে হয়, সনকা পুরাণ ও ইতিহাস হইতে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি তাহা কিছুতেই বুঝিলেন না—তবে মনসা যাহাতে নখিন্দরের কেশ-স্পর্শ করিতে না পারেন, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে করিতে পুত্রের বাসের জন্ত নিকটবর্ত্তী শাতালী পর্ব্বতে লৌহনির্ম্মিত গৃহরচনার

বন্দোবস্ত করিলেন—দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার নির্ম্মাণকার্য্যে ব্রতী হইলেন। বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার বাসরগৃহ প্রস্তুত হইল। মনসা ভাবিলেন,—চাঁদ বিষম প্রমাদ ঘটাইল। লৌহময় গৃহে সর্পের প্রবেশ সুখ-সাধ্য নহে। অতএব তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে অনুরোধ করিলেন, যেন তিনি সেই বাসরগৃহের দেওয়ালে একটী ছিদ্র করিয়া রাখেন। বিশ্বকর্ম্মা অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, তাহাই করিলেন। মনসা দেবীও নিশ্চিন্ত হইলেন। নিরূপিত দিবসে মহা আড়ম্বরের সহিত চাঁদ পুত্রকে লইয়া নিছনী নগরে উপস্থিত হইলেন। যথানিয়মে বেহুলার সহিত নখিন্দরের বিবাহ হইয়া গেল। অতঃপর হৃষ্টচিত্তে চাঁদ জ্ঞাতিকুটুম্বগণ সহ আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া চাম্পাই নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। পুরাঙ্গনাগণ ও প্রতিবেশি-মণ্ডলী বেহুলার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া শত মুখে সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। অঙ্গনাগণের বিশ্বাস, এমন রূপ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইবার নহে। বধূর রূপের সুখ্যাতি শুনিয়া সদাগরের সুখের সীমা রহিল না। ফুলশয্যার রাত্রি বর কন্যা শাতালী পর্ব্বতের লৌহময় বাস-গৃহে অতিবাহিত করিবেন স্থির হইয়াছিল। গৃহনির্ম্মাণাবধি তাহাতে রক্ষী নিযুক্ত ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নখিন্দর অভিনব প্রণয়িনীর সহিত শাতালীর লৌহময় গৃহে গমন করিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রিকালে নখিন্দর ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলে বেহুলা অন্ন ব্যঞ্জন ও শীতল জলে স্বামীর ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ করিলেন। তাহার পরে উভয়ে পাশক্রীড়ায় রজনীর অধিকাংশ যাপন করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। মনসা দেবীর আজিকার রাত্রিতে নিদ্রা নাই, তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতেই হইবে। তিনি নানাজাতীয় বিষধর সর্পকে শাতালী পর্ব্বতে পাঠাইলেন। অনেকেই সেই লৌহ-ময় গৃহ দুষ্প্রবেশ বলিয়া ফিরিয়া আসিল। তিনটী সর্প বেহুলা সুন্দরী কর্ত্তৃক ধৃত হইল। তিনি সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া পতির প্রাণের নিমিত্ত প্রহরীর কার্য্য করিতে ছিলেন, মনসার অভিশাপ তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরূক ছিল। ত্রিযামার অন্ত্য যামে বেহুলার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি অঘোরে ঘুমাইতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টাতেও তাঁহার নিদ্রার ঘোর ঘুচিল না। এই সুযোগ পাইয়া কালীয় নামে তীব্র বিষধর-সর্প বিশ্বকর্ম্মা-রচিত ছিদ্র দিয়া লৌহগৃহে প্রবিষ্ট হইল। সুবর্ণের দীপে গৃহ আলো-কিত, নবদম্পতী ঘোর নিদ্রাভিভূত। সর্প-জাতি ক্রূর হইলেও বিনাপরাধে কাহাকেও দংশন করে না বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তদনুসারে কালীয় নাগকে অপরাধের সুযোগ অন্বেষণ করিতে হইল। কালীয় নাগ মনসার আজ্ঞায় তাঁহাদের প্রাণনাশের জন্য উপস্থিত, কিন্তু সেই দীপালোক-সমুদ্ভাসিত নবদম্পতীর রূপ-মাধুরী দর্শনে তাহাকেও কিয়ৎকালের জন্য তাঁহাদের শয্যা-পার্শ্বে স্তম্ভিতভাবে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। এই অবসরে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন-

কালে কালীয়নাগের অঙ্গে নখিন্দরের পাদস্পর্শ হইল। এই অপরাধ পাইয়া নাগ তাঁহাকে দংশন করিল। বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া নখিন্দর জাগ্রত হইলেন, বেহুলাকে ডাকিয়া জাগাইলেন। পতির মুখে সর্পদংশনবার্ত্তা শুনিয়া বেহুলা অধীর হইলেন। কালীয় নাগকে দেখিতে পাইয়া সোণার জাঁতি নিক্ষেপে তাহাকে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে কালীয়ের পুচ্ছচ্ছেদ ঘটিল, কালীয় প্রস্থান করিলেন। অচিরে নখিন্দরের প্রাণবিয়োগ হইল। বেহুলা কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদনে বনের পশু, গাছের পাখীও অস্থির হইল। বেহুলার চীৎকার ক্রন্দনধ্বনি শাতালী পর্ব্বত হইতে চাঁদ সদাগরের বাড়ীতে পৌছিল। সনকার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পুত্রবধূর ক্রন্দনধ্বনিতে তিনি বিকলচিত্ত হইয়া শাতালী পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। লোহার বাসরে প্রবিষ্ট হইয়া পত্নীক্রোড়গত নখিন্দরের শবদর্শনে পাগলিনীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। অসাবধান বলিয়া বেহুলাকেও যার পর নাই তিরস্কার করিলেন। প্রভাতের বায়ু ধীরে ধীরে অর্দ্ধ-জাগরিত চাঁদ সদাগরের কর্ণে তাহাদের ক্রন্দনধ্বনি বহন করিতেছিল, এমন সময়ে তাঁহার ভৃত্য তথায় উপস্থিত হইয়া সেই দুঃসংবাদ জানাইল। চাঁদ ছয়টী পুত্রের শোকে পূর্ব্ব হইতেই সমধিক ব্যথিত ছিলেন। তাহার উপর নখিন্দরের মৃত্যুসংবাদ তাঁহার পূর্ব্ব শোক শতগুণে বৃদ্ধি করিল। তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন; অবিলম্বে শাতালী পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় শোকের হাট বসিয়াছে—আত্মীয় স্বজন সকলেই সমবেত—সকলেরই চক্ষে জল, সকলেরই মুখে হায় হায় শব্দ। চাঁদ সদাগর অনেকটা শোক সম্বরণ করিলেন, পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। বেহুলা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন,—তিনি মৃতপতিকে ভেলায় লইয়া জলে ভাসিয়া যাইবেন, আর যে কোন প্রকারে হউক তাঁহাকে জীবিত করিবেন। সত্যবান্‌সীমন্তিনী সতী সাবিত্রী ব্যতীত আর কাহাকেও এরূপ দুঃসাধ্য প্রতিজ্ঞা করিতে শুনা যায় না। সাবিত্রী সতী সাধ্বী, পতিব্রতা বেহুলাও তাঁহার অনুকৃতি। সমাগত ব্যক্তিগণ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন—বেহুলা মৃতপতির শব লইয়া জলে ভাসিয়া যাইবেন, এ কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। কদলী বৃক্ষের মান্দাস বা ভেলা প্রস্তুত হইল। বেহুলা নখিন্দরের শব লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। মান্দাস গাঙ্গুর নদীর জলে ভাসিয়া চলিল। গাঙ্গুর নদী এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে। উহা বর্দ্ধমান জেলার বৈদ্যডাঙ্গা, রসুলপুর, আমাদপুর প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়া প্রবাহিত ছিল। অদ্যাপি কোন কোন স্থানে তাহার চিহ্ন আছে।

দুঃখ কি ?

বালিকা বয়সে বিধবা হইয়া আমি হতভাগিনী বলিয়া সকলের নিকটে করুণার পাত্রী হইয়া উঠিলাম। যে আমায় দেখিত, সেই বলিত "আহা"। চারি দিক্ হইতে সকলের সমবেদনা ও সহানুভূতি পাইয়া ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করাই আমার বৃথা হইয়াছে। কারণ সংসারের সুখ ভোগ করা আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। যাঁহারা সৌভাগ্যবতী, তাঁহারা বুঝি সকলেই সুখস্বর্গের উচ্চতম স্তরে অধিরোহণ করিয়া শান্তির বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, আর আমি অভাগিনী সেই স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া একেবারে অসুখিনী, অশান্তির নরকে পতিত হইয়াছি।

মনের সন্তাপ বাড়িতে লাগিল, ভাবিলাম, "ভগবান্! আমি তোমার চরণে কি এমন অপরাধ করিয়াছি, যে শুধু আমারই জন্ম এই অশান্তির নরক সৃষ্টি করিয়াছ?" এই কথা লইয়া একদিন ভগবান্‌কে জোর করিয়া ধরিলাম। প্রতিমূর্ত্তিতে যে ভগবান্ বিরাজিত থাকেন, তাহা হিন্দুকুলকন্যা আমি শৈশব হইতেই শিখিয়াছিলাম। পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, কায়মনোবাক্যে ডাকিলাম, "দয়াময়! শুনিয়াছি সুখ দুঃখের নিয়ন্তা তুমি,—ন্যায়বান্ সূক্ষ্ম বিচারক তুমি,—আমার মত পাপী কি জগতে আর কেহ নাই, তাই একা আমাকেই কেবল এই দণ্ড প্রদান করিয়াছ? সকলেই যখন আমাকে দেখিয়া দুঃখপ্রকাশ করে, তখন কি জগতে আমিই সকলের চেয়ে বেশী দুঃখী? মা আমার দুঃখে শোকাকুল হইয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন, বাবা আমায় দেখিলেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সমবয়স্কাগণ আমাকে দেখিলে মুখ ভার করিয়া লয়, ভাইভগিনীরা সকলেই আমার দুঃখে দুঃখিত, বিরস বদন, আমার হইয়াছে কি? আমি আর ত কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারি না, তাই নিভৃতে তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, "হে নারায়ণ! কি করিলে আমার এ দুঃখ দূর হয়, তাহা তুমি বলিয়া দিতে পার নাকি?"

শুনিলাম, মনে মনেই যেন কে বলিয়াদিল, তাহা তখন ভগবানের প্রত্যাদেশ বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। বলিলেন, "দুঃখ কিসের? সংসারে সকলের নিত্য যাহা ঘটিয়া থাকে, তোমারও তাহাই হইয়াছে, সৃষ্টিছাড়া কিছুই হয় নাই। তাহাতে আর তোমার দুঃখ কি? আর দেখ, জগতে সকলেই দুঃখী, সুখ বলিয়া একটী পরম পদার্থ যাহা আছে, তাহা কেহই পাইবার ইচ্ছা করে না। কি করিলে যে সেই সুখ পাওয়া যায়, তাহাও কেহ জানে না, অথচ সেই সুখকে ধরিবার জন্য বিপরীত পথে, বিপরীত চেষ্টায়

ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং দুঃখেরি এক একটা আকৃতিকে লোকে সুখ বলিয়া মনে করে। দুঃখের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে লোকে কল্পনায় সুখের নাম দিয়া তাহারই কামনা করে। কিন্তু দুঃখ,—চির-কালই দুঃখ,—তাই যখন তাহার কল্পিত ছদ্মবেশ খসিয়া পড়ে, তখন আবার লোকে দুঃখের সেই ভয়ানক বীভৎস আকার দেখিয়া, আকুল প্রাণে কাঁদিয়া উঠে। জগৎ সংসার শূন্য বোধ করে, তাহার প্রাণের যেটুকু প্রফুল্লতা ও সন্তোষ, তাহা বিনষ্ট হইয়া, তাহাকে মলিন ও শ্রীভ্রষ্ট করিয়া দেয়। এই যে দুঃখ,—তাহা সুখের বিচ্ছেদে নয়, কিন্তু দুঃখের উপর দুঃখ। দুঃখ অনিত্য, সুখ নিত্য। যাহার ক্ষয় বৃদ্ধি আছে, প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যাহার পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর নিত্য সংঘটিত হইতেছে, সেরূপ বস্তু মাত্রেই দুঃখ। যাহার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, প্রকৃতির নিয়ম যাহা স্পর্শ করিতে পারে না, যাহা চির-স্থায়ী,—তাহারই নাম সুখ। একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভ করিলেই কেবল এই নিত্য সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তোমরা সংসারে সচরাচর যে সকল বস্তুকে সুখ বলিয়া মনে কর, বস্তুতঃ তাহা সুখ নয়, আকারভেদে দুঃখেরি নামান্তর। কারণ, তাহা পরিবর্ত্তন-শীল, সংসারের ধন-মান, পতি-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, আমোদপ্রমোদ, ভোগবিলাস প্রভৃতি যাহা তোমরা সুখকর বলিয়া পাইতে চাও, তাহা সমস্তই দুঃখ। কারণ সংসারই অনিত্য এবং দুঃখময়, অর্থাৎ আজ আছে, কাল নাই। তোমরা ত তাহা প্রতিদিন অনুভব করিতেছ।

আশ্চর্য্য এই যে, এ মহাদুঃখ নিবৃত্তির উপায় কেহ জানিতে ইচ্ছাও করে না। মানুষ এই দুঃখের ছলনাকেই ভালবাসে, বার বার প্রতারিত হইয়া, বার বার প্রাণে আঘাত পাইয়াও লোকে কিছুতেই এ দুঃখের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে চায় না। মানুষ এমনই ভ্রান্ত! তা তুমি যদি এ দুঃখের নিবৃত্তি করিতে চাও, ভালই ত, আমি তোমাকে সুখের সন্ধান ক্রমেই বলিয়া দিব। আর জানিও, দুঃখই ভগ-বানের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবার সোপান, দুঃখের তাড়না না পাইলে লোকে সত্য-পথ বা ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে আগ্রহান্বিত হয় না।”

শুনিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, প্রাণে যেন একটা অননুভূত আনন্দ অনুভব করিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আবার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিল, বিশ্বাসের স্থান ভ্রান্তি অধিকার করিল, ভাবিলাম, উহা কিছুই নয়, আমারই পাগল মনের একটা খেয়াল।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। বাবা আমার দুঃখময় জীবনকে শান্তিময় করিবার জন্য কত হিতোপদেশ দিতেন, হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করি-বার জন্য কত ধর্ম্মপুস্তক আমার পাঠের জন্য আনিয়া দিতেন। স্নেহময়ী মা আমার, সর্ব্বদা আমায় চক্ষে চক্ষে রাখিতেন, পাছে আমি কোন সময় নিজের দুঃখ

অনুভব করিয়া বিষণ্ণ হই। পাড়াপ্রতিবাসিগণ বলিতেন, "আহা, তোমার জন্মটা ত বৃথা হইল, এখন ধর্ম্মকর্ম্মের কাজে জীবনের দিন কটা কাটাইয়া দাও। অতি দুঃখেও তখন আমার হাসি পাইত, মনে করিতাম, সকলেই যদি দুঃখী, তবে আমারই বা এমন কি হইয়াছে যে, সংসারের সকলের করুণদৃষ্টি আমার উপর পড়িয়াছে? কিন্তু মনের প্রাকৃতিসিদ্ধ অভাব ও অশান্তি সময়ে সময়ে যখন প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিত, তখন আবার ভাবিতাম, সত্য সত্যই বুঝি আমার মত দুঃখী জগতে আর নাই।

তারপর ক্রমেক্রমে শুনিতে লাগিলাম, "আজ অমুকের একমাত্র উপযুক্ত পুত্র মারা পড়িয়াছে," "আজ অমুকের স্ত্রী বিধবা হইয়াছে।" আবার একদিন শুনিলাম—"আজ অমুক ব্যক্তি পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে" ইত্যাদি। নিত্যই এইরূপ শুনিতে পাই, সর্ব্বদাই শোকস্থানে গিয়া দেখি, অপরাপর ব্যক্তিগণ সেইরূপেই শোকার্ত্তদিগকে সান্ত্বনাদান করিতেছেন, কেহ কেহ বা আপন মৃত আত্মীয়বর্গের জন্য শোকাকুলমানসে শোকাশ্রু ফেলিয়া সন্তশোকার্ত্ত ব্যক্তিদিগের প্রাণে সহানুভূতি ঢালিয়া দিতেছেন। কাল আমার শোকে যাঁহারা সান্ত্বনা দান করিয়া গিয়াছেন, আজ আমিই আবার তাঁহাদের শোকেএকবার 'আহা' বলিয়া আসিলাম। সংসারের সর্ব্বত্রই এই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই, আজ আমার যে দুঃখ, কাল অপরের হয়ত তাহাপেক্ষাও অধিক দুঃখের কথা শুনিলাম। আবার আর একজনের হয়ত পাষাণদ্রবকারী মর্ম্মদাহ ও কাতরতা দেখিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারি না। ক্রমে জ্ঞানচক্ষু ফুটিতে লাগিল, দেখিলাম,—দুঃখের করাল মূর্ত্তি, রোগ, শোক, মোহ, দারিদ্র্য প্রভৃতি শত শত বদন বিস্তার করিয়া, জগত সংসার গ্রাস করিবার জন্য লালায়িত। তাহার সেই জলন্ত লেলিহান রসনার গ্রাস হইতে রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র কাহারও নিস্তার নাই। সকলেই দুঃখের করাল গ্রাসে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। সেদিন ভগবানের প্রত্যাদেশ বলিয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, এখন তাহার যথার্থতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া নিজের দুঃখ বিস্মৃত হইলাম। সত্যই ত জগতে কেহই তবে সুখী নয়, তবে আর দুঃখ কিসের জন্য? সকলেরই প্রায় এক দশা—ইহাই মানবমনের সান্ত্বনার একটা প্রধান কারণ।

সেই অবধি নিজের দুঃখ ভুলিয়া কেবল পরের দুঃখের প্রতি ব্যথিতহৃদয়ে চাহিয়া দেখিতাম। কত সাজান সোণার সংসার ছার খার হইয়া যাইতেছে, কত হাস্যপ্রফুল্ল সুন্দর মুখ বিষাদের আঁধারে মলিন হইয়া যাইতেছে, কত নির্ম্মল প্রাণে কালিমা সঞ্চার হইতেছে। দেখিয়া দেখিয়া মনে হইত, হায়! হায়! এই ত সংসারের সুখ,—এই সুখে আমি বঞ্চিতা হইয়াছি বলিয়া আমার আত্মীয় স্বজন এত শোকা-

যদি আমাকে হারাইতে হয়, তবে জেনো এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি পৃথিবীতে থাক্‌তে পার্‌ব না।

"তা বেশ" এই বলিয়া স্ত্রী একখানি "উদ্ভ্রান্ত প্রেম" ও একখানি "প্রেম ও ফুল" বাহির করিয়া স্বামীর হাতে দিলেন। স্বামী বই দুখানি দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, এরা যোচ্চোর, পাজী, পাষণ্ড। যে স্ত্রী মরিলে আবার বিবাহ করে, তাহার ন্যায় নরাধম পৃথিবীতে নাই।

স্ত্রী। এ কথা বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু বিশ্বাস করেও কর্‌তে পাচ্ছিনা। কারণ তাঁহারা তোমাদেরই জাতি অর্থাৎ পুরুষ ত বটে।

স্বামী। ছি জবা! তুমি পুরুষজাতিকে বড় অবজ্ঞা কর। ইহা বুঝিতে পার না যে সব পুরুষই কি এক রকম।

স্ত্রী। পুরুষ আবার ভাল মন্দ কি? সবই এক।

স্বামী। ছি জবা! এ সব কথা কি তোমার মুখে শোভা পায়? তোমার স্বামী যে তোমা-গত প্রাণ।

যাক্ সে কথা এখন, একটু মহাভারত পাঠ করা যাক্। এই বলিয়া স্ত্রী একখানি রাজকৃষ্ণ রায়ের মহাভারত বাহির করিয়া স্বামীর হাতে দিলেন। স্বামী কিছুক্ষণ এ কথা সে কথার পর মহাভারত পড়িলেন। ভীষ্মবধ, কর্ণবধ, অভিমন্যুবধ পড়িলেন। তাহার পর বই পার্শ্বে রাখিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। স্ত্রীও অতিগম্ভীর ভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরিহাসপ্রিয়া স্ত্রীর এরূপ গম্ভীর ভাব দর্শন করিয়া স্বামী কহিলেন, ও কি?

স্ত্রী। পুরাকালের বীর কবিদের কথাই ভাবিতেছি। দেখ, তাঁহারা সব ভারতবাসীরই পূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু এখন তাঁহাদের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কোন নিদর্শন ভারতের কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। ইতিহাস বা কিম্বদন্তীই ইঁহাদের পূর্ব্বখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার পরিচয়স্থল। মহাভারত ও রামায়ণ, স্বদেশপ্রেমিকতা ও নিঃস্বার্থ রাজভক্তির প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসের একটী মহাযোগ। স্বদেশের গৌরব-গরিমা ও পিতৃপুরুষের সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই বীরগণ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যে বিস্ময়কর বীরত্ব ও অসীম আত্মত্যাগের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, রাজস্থান ব্যতীত জগতের ইতিহাসে আর কোন জাতির বীরত্ব ও আত্মত্যাগের সেরূপ উদাহরণ পরিলক্ষিত হয় না। পুরাকালে রোগের আতিশয্য বড় ছিল না, অতএব কোন বীরই শয্যার উপর দেহত্যাগ করিতেন না। ইহা কবিজনের অতিরঞ্জন অথবা কপোলকল্পিত কথা নহে। ইহা যথার্থ কথা—নিরলঙ্কার, বিশদ, সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্য। যাহাদের মনে মনে এরূপ ধারণা আছে যে, হিন্দু বীরগণ স্বদেশপ্রেম কাহাকে বলে তাহা জানেন না, তাঁহারা একবার এই প্রদীপ্ত কাব্য অনুশীলন করিয়া দেখুন।

স্বামী। ভারতবাসিনীগণের পতিভক্তিও অতি উচ্চ। এমন নারীচরিত্র অন্য কোন স্থানে নাই।

স্ত্রী। এ কথা ধ্রুব সত্য। এই সব গ্রন্থ সতীচরিত্রের প্রদীপ্ত আদর্শ। ভারতবাসিনীগণ যেমন পতির আদর জানেন, ভারতবাসীর নিকটেও সতী নারী সেইরূপ আদরণীয়া। দুর্গোৎসব, গঙ্গাপূজা, উমার্চ্চনা প্রভৃতি ক্রীড়াই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। রামায়ণ ও মহাভারত দুইই অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু প্রভেদ দেখা যায়।

স্বামী। কি প্রভেদ?

স্ত্রী। বেদব্যাস অপেক্ষা বাল্মীকিই সতীচরিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

স্বামী। কিসে?

স্ত্রী। পঞ্চ স্বামী কর্ত্তৃক রক্ষিতা মহাভারতের নায়িকা দ্রৌপদী হইতে সীতার চরিত্র অধিক অনুকরণীয়।

স্বামী। তবে তুমি মহাভারতকে অপছন্দ করিতেছ?

স্ত্রী। না না, মহাভারতের নিন্দা কে করিতে পারে? রুক্মিনী, সত্যভামা, সুভদ্রা ও উত্তরাদি নারীর চরিত্র কি চমৎকার। গান্ধারী ত চরিত্রে অতুলনীয়া। কবি অতি বিচক্ষণতার সহিত ও অতি সূক্ষ্ম তুলিকা দ্বারা গান্ধারীর চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। দানে, ধর্ম্মে, ক্ষমাতে, নিষ্ঠাতে, ধীরতা ও সহিষ্ণুতাতে, সৌন্দর্য্যে, বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে, প্রতিভাতে, সর্ব্বোপরি সতীত্বে তাঁহার চরিত্র শোভমানা ছিল। একাধারে এ সমুদয় গুণই গরীয়সী গান্ধারীর উন্নত ও কোমল হৃদয়ে অধিকার লাভ করিয়াছিল। গান্ধারী অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। যখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, পিতা তাঁহাকে অন্ধ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, তখনই তিনি বস্ত্র দ্বারা আপন চক্ষুযুগল বন্ধন করিয়া ভাবি স্বামীর ন্যায় দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া রহিলেন। এই লাইন কয়টী পাঠ করিলেই গান্ধারীর হৃদয়ে-মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

"শুনিলা গান্ধারী তাঁর পিতা মহাশয়
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সনে দিবে পরিণয়।
তখন পতির প্রতি ভক্তির কারণ
বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিলেন যুগল নয়ন॥

রাজকৃষ্ণ রায়—মহাভারত।

সত্যবাদিনী ও সত্যপরায়ণা দেবী গান্ধারী বস্ত্রখণ্ড দ্বারা নিজ চক্ষু আবৃত করিয়া চিরান্ধের ন্যায় অন্ধ সাজিয়া চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু মূল মহাভারত হইতে কাশীদাসী মহাভারতের স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ। কাশীদাসী মহাভারতে এমন সকল ঘটনা আছে যাহা নাকি মূল মহাভারতে খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না এবং তাহার মধ্যে অধিকাংশই অশ্লীল, ও শ্রুতিকটু। কাশীদাসী মহাভারত পড়িয়া দেশের সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে সেই সব অমূলক কথা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

স্বামী। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ঠিক এবং ইহা অতি দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করি।

স্ত্রী। এই দেখ না, সুভদ্রা-চরিত্রটাকে কাশীরামদাস কি কুৎসিত করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন। দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর স্ত্রী হইলেও তিনি সেই পঞ্চ পতিরই ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। দান, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, ক্ষমা, নিষ্ঠা ইত্যাদি বিবিধ গুণে সমলঙ্কৃতা ছিলেন। কিন্তু কাশীদাস দ্রৌপদীর চরিত্রপটেও ভাল রং ফলাইতে পারেন নাই। গান্ধারী এক দিকে অপার বীর্য্যশালিনী, অপরদিকে কুসুম-কোমলা। এক দিকে কঠোর কর্ত্তব্যপালিকা, অপর দিকে স্নেহময়ী ও সত্যবাদিনী। কিন্তু কাশীদাস গান্ধারীকেও উপযুক্ত করিয়া গড়িতে পারেন নাই। সতী সত্যভামা, ধর্ম্মাধার রুক্মিণী দেবী, কুন্তী, মাদ্রী কাহারও চরিত্র উপযুক্তরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। কাশীদাস কর্ণচরিত্রকে এমন বিকৃত করিয়াছেন যে, কাশীদাসী মহাভারতকে কর্ণকলঙ্ক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এতদ্ব্যতীত নকুল, সহদেব, যুধিষ্ঠির, শল্য ইত্যাদি বীরগণের চরিত্রও ঠিক গঠন করিতে পারেন নাই।

স্বামী। মূল রামায়ণ হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণেরও অনেক প্রভেদ। কিন্তু কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাস এক মহাভারত ও রামায়ণ লিখিয়াই অশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের সেই সাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধি লইয়া অসাধারণ কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রী। তা যাই বল, তাঁহাদের মধ্যে পুরুষত্ব গুণ ত ছিলই। তাঁহাদের জীবনচরিত পড়ি নাই, জানি না তাঁহারা কয় বিবাহ করিয়াছিলেন। স্বামী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আবার ঐ কথা। এত যে বলি, —যে সব পুরুষই একপ্রকার হয় না, তাহা তুমি বুঝিতেই চাও না।

স্ত্রী। পুরুষের মধ্যে সবই এক। তবে হাজারের মধ্যে একটী আর আধটী।

স্বামী। একটী আর আধটী কি?

স্ত্রী। পত্নীপরায়ণ। স্ত্রী মরিলে আবার বিবাহ করে না। পুরুষের মধ্যে যাঁহারা স্ত্রী বিয়োগের পর বিবাহ করেন না, তাঁহারা দেবতা। দেবতার নাম করলেও পুণ্যি। তাঁহারা পুরুষ হইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রগাঢ় পত্নীপ্রেমের ও অসাধারণ বীরত্ব গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

স্বামী। তবু ভাল, দুটী চারটী পুরুষও তোমার চক্ষে সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

"আচ্ছা গল্প এইখানেই শেষ হোক্," বলিয়া জবা অন্য ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন।

স্বামী শাবক স্ত্রীর গমনে বাধা দিতে সাহস না করিয়া কেবল হতাশ নেত্রে স্ত্রীর গমনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে স্ত্রীর পরিত্যক্ত বিছানায়

পড়িয়া "বাণী" প্রণেতা রজনী বাবুর হাসির গানগুলি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

বিংশতিবর্ষয়া জবা ও ২৩ বৎসর বয়স্ক শরৎ বাবুর এইরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতার মধ্য দিয়া আরো বিংশতি বৎসর চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের কোন পুত্র বা কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল না।

(ক্রমশঃ)

ইতর প্রাণীর নিকট প্রেমের শিক্ষা।

স্কটল্যাণ্ডদেশীয় সুবিখ্যাত সাহিত্য-সেবী পণ্ডিত সার ওয়াল্টার স্কটের বাল্য-জীবনে একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঘটনাটী সামান্য হইলেও ইহাতে বিশেষ শিক্ষিতব্য বিষয় নিহিত রহিয়াছে। একদা স্কট্ একটী কুকুরকে লক্ষ্য করিয়া ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কুকুরটী আঘাত প্রাপ্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। প্রহারে কুকুরটীর একখানি পা ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু সে ভগ্ন পা লইয়া প্রহারকর্ত্তার পদলেহনে প্রবৃত্ত হইল। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া স্কট্ অনুতাপের যন্ত্রণায় অস্থির হইলেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার ঐ নৃশংস কার্য্যের কথা ভুলিতে পারেন নাই; এবং ঐ ঘটনা হইতে তিনি দয়াশীলতা, ও মহত্ত্ব, অনুভব করিয়া পরবর্ত্তী জীবনে দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে কদাপি বিরত হয়েন নাই।

খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা যীশু এক স্থানে বলিয়াছেন,—"যদি কেহ তোমার এক গালে প্রহার করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রহার করিবার জন্য অন্য গাল ফিরাইয়া দাও।" আমাদের দেশীয় নীতি-শাস্ত্রবেত্তা চাণক্য পণ্ডিত সকলের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "মাতৃবৎ পরদারেষু পর-দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥" ইহার অর্থ, যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরের বস্তুকে লোষ্ট্রের মত এবং সকল জীবকেই আপনার ন্যায় দর্শন করেন, তিনিই পণ্ডিত। চাণক্য পণ্ডিতের জন্য যে আদর্শ নিদর্শন করিয়াছেন, যীশুখৃষ্ট সকলের জন্য সে আদর্শ ধরিয়া দিতেছেন। কিন্তু এতদ্বিধ মহান্ উপদেশ পাইয়াও লোক প্রেমিক হইতে পারিল কই? যাঁহারা খৃষ্টান নাম গ্রহণে খৃষ্টের শিষ্য বলিয়া জগতের সম্মুখে স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারাও প্রহার-কারীকে উল্টে প্রহার করিতে নিবৃত্ত হয়েন না। প্রহারকারী আততায়ীকে

প্রেম করিবেন, এত দূরের কথা, অনেকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিরপরাধীকেও প্রহার করিতে উদ্যত হয়েন। বালক স্কটের জীবনেই এরূপ ঘটিয়াছে এমত নহে, নিরীহ কুকুরটীকে নিরর্থক প্রহার করিয়া তিনিই কেবল নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন এমত নহে, অনেক বয়স্ক পুরুষ এবং বয়স্ক মহিলা জীবনের অনেক কাজে এরূপ অপ্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা কেবল ইতর প্রাণীর প্রতিই নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন এমত নহে, তাঁহারা মানবজাতিকেও অনেক সময় দুর্ব্ব্যবহারে পীড়িত করিয়া থাকেন। অপরিচিত ব্যক্তির কথা বলিতেছি না, অনেক সময় বন্ধু ও আত্মীয়গণও তাঁহাদিগের অবৈধ ব্যবহার হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। অজ্ঞ ক্রোধী ব্যক্তিগণই প্রহার দ্বারা ক্রোধের পর্য্যবসান করিয়া থাকে, কিন্তু শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিরা তদ্রূপ ব্যবহার না করিলেও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ কিংবা অপরের বস্তু বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া নৃশংসতার পরিচয় দিয়া থাকেন। ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ কিংবা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে তাহাদের কোন ফলোদয় হয় না। তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত অপ্রেম কিছুতেই অপসারিত হয় না। ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে আত্মসংযমন করিতে পারেন না। লোভের কারণ উপস্থিত হইলে বলপূর্ব্বক অপরের স্বত্ব বিলুপ্ত করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। ইহাদিগের জীবন উল্লিখিত কুকুরটীর জীবন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কুকুরটী কোন ধর্ম্মশাস্ত্র পড়ে নাই, কোন ধর্ম্মোপদেশ শুনে নাই, অথচ প্রহারকারী আততায়ীকে দংশন না করিয়া পদলেহনে প্রেমের পরিচয় দিয়াছিল। বীরত্বাভিমানী গর্ব্বিত মানুষ এতাদৃশ পদলেহনকে ভীরুতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ মনে করিতে পারে। তাহাদের "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" নীতি প্রহারকারীকে পুনঃ প্রহার করিবার জন্যই ব্যবস্থা প্রদান করিবে, কিন্তু প্রেমের উচ্চ-আদর্শ তাহা নহে। যীশু যাহা উপদেশ দিয়াছেন, কুকুরটী যাহা ব্যবহারে দেখাইল, তাহাই প্রেমের উচ্চ আদর্শ। স্কট্ মানুষ, স্কট্ খৃষ্টান, স্কট্ ভাল মন্দের তারতম্য করিতে সক্ষম, কিন্তু তিনি ব্যবহারে কুকুরের পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। তাই বলি, ইতর প্রাণী হইতেও মানুষের অনেক শিক্ষিতব্য রহিয়াছে। মানুষ বিবেকের অভিমান করিয়া জীবজগতে শ্রেষ্ঠ আসন লইবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু পশ্বাদি ইতর প্রাণী স্বাভাবিক সংস্কার বশতই হউক, কিম্বা শিক্ষাজন্যই হউক, সময় সময় যেরূপ সাধুতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকে, মানুষ তাহা দেখাইতে পারে না। মানুষের বিবেক থাকিলে কি হয়? যদি বিবেক সাধু ইচ্ছার সহিত যোগ করিয়া কাজ করিতে না পারে, বিবেক যাহা ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, ইচ্ছা যদি দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে সে বিবেকের মূল্য অতি

কম। এইরূপ বিবেকযুক্ত মানুষকে অনেক সময় পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীতে স্থান দিতে প্রবৃত্তি হয়। তাই বলি, মানব! তুমি যদি আপনার গৌরব রক্ষা করিতে চাও, তুমি যদি বিবেককে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইতে চাও, তাহা হইলে প্রেমের দীক্ষা লইয়া আপনাকে ভুলিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে স্বার্থপরতার পূতিগন্ধময় পঙ্কিলতা সরাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রেমের সুগন্ধিযুক্ত ফুল ফুটাইতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে উল্লিখিত কুকুরের অনুকরণে আততায়ীকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হও।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারি।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। পালাজ্বরের ঔষধ। জ্বর হওয়ার পর দিবস প্রাতে থুলকড়ী (থানকুনী) পাতার স্বরস (জলযুক্ত না করিয়া খাঁটি রস) দুই তোলা, পানের স্বরস দুই তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জ্বর বন্ধ হয়।

২। হাঁপানির ঔষধ। রক্ত পুনর্ণবার শিকড় চারি আনা, সাদা জীরা আড়াইটী এক সঙ্গে বাটিয়া তিন দিবস প্রাতে সেবন করিলে হাঁপানী রোগ দূর হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে কলাগাছ সম্বন্ধীয় সমস্ত খাদ্য পরিত্যাগ করিবে।

৩। স্বরভঙ্গের ঔষধ। সৈন্ধবের সহিত কচি কুলপাতা গব্যঘৃতে ভাজিয়া ঐ ঘৃতসহ উহা অবলেহন করিলে স্বরভঙ্গ নিবারণ হয়।

৪। রক্তপ্রদরের ঔষধ। বকুল পাতার রস দুই তোলা, অর্দ্ধ তোলা চিনি সহ তিন দিন প্রাতে সেবন করিলে রক্ত বন্ধ হইবে।

৫। চক্ষুওঠার ঔষধ। কচি বেলপাতা দুই তিনটী, টাট্‌কা ছাগ দুগ্ধের সহিত পরিষ্কৃত প্রস্তরের পাত্রে উত্তমরূপে বাটিয়া তাহাতে ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া শিশির মধ্যে ছিপি আঁটিয়া রাখিবে, এবং তাহা বারংবার বিন্দু বিন্দু চোখে লাগাইবে। প্রত্যহ টাট্‌কা দুগ্ধ ও কচি বেলপাতা দিয়া প্রস্তুত করিবে। ইহাতে শীঘ্র আশ্চর্য্য উপকার হয়।

৬। রক্ত আমাশয়ের ঔষধ। একটী পিঁয়াজের অগ্রভাগ কাটিয়া ঐ পিঁয়াজের মধ্যে একটু ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সর্ষপপরিমাণ আফিঙ দিবে, এবং সেই ছিন্ন অগ্রভাগটী (মুখুটী) পেঁয়াজের ছিদ্র মুখে চাপা দিয়া সমস্ত পিঁয়াজটী তপ্ত ভস্ম মধ্যে রাখিবে, মুখুটীর দিকটী যেন ছাই চাপা না পড়ে, আগাটুকু যেন বাহিরে থাকে। এইরূপে বহুক্ষণ রাখিয়া, উহা মন্দ উত্তাপে সিদ্ধ হইলে, ঐ পিঁয়াজটী অনাবৃত স্থানে সারা রাত্রি রাখিবে। প্রাতে সমস্ত

পেঁয়াজটী চর্ব্বণ করিয়া খাইয়া বাসি জল পান করিবে। এইরূপ তিন চারি দিন সেবন করিলে প্রবল রক্তামাশয় সারিয়া যায়।

নূতন সংবাদ।

১। ৭ই মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষ্যে কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ শ্রীমুনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও শ্রীমতী ম্যাকফার্‌সন পারিতোষিক বিতরণ করেন। কলিকাতা বেথুন বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উক্ত দিবসে হইয়াছে।

২। ১০ই মার্চ্চ। কলিকাতা ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়ের বালিকাদিগের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও মহারাণী পারিতোষিক বিতরণ করেন।

৩। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণকালে আগামী ১০ই এপ্রিল ভারতের জয়পুরের মহারাজকে ডাক্তার অব্ ল (D. L.) উপাধি দিবেন শুনা যাইতেছে।

৪। ৯ই মার্চ্চ সোমবার প্রাতে স্বদেশভক্ত শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মুক্তি লাভ করিয়াছেন এবং ১০ই মার্চ্চ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য কলিকাতায় অনেকে আলোক ও পুষ্পমালায় গৃহ সুসজ্জিত করিয়াছিল।

৫। "কি কারণে বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাস হইতেছে এবং তাহা নিবারণের উপায় কি?"—এই বিষয়ে যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেই প্রবন্ধলেখককে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। এবং তাঁহার প্রবন্ধটী বঙ্গদর্শনে ও আবশ্যক হইলে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা যাইবে। লিখিত প্রবন্ধ, আগামী ১২ই আশ্বিনের মধ্যে ১৯নং ষ্টোর রোড —বালীগঞ্জ, কলিকাতা—এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরিতব্য। বিচারক:—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী।

৬। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমতী রাজাম্মল সারগুননিয়া নাম্নী একটী মহিলা বি, এ, পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

৭। সীমান্তে জাকাখেলদিগের বিরুদ্ধে ইংরাজরাজ যে সমর ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার ফলে সীমান্তবাসিগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ঘটক ও অনুসন্ধান—বিবাহ, ধর্ম্ম, নীতি ও সামাজিক মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র লাহিড়ী কর্ত্তৃক কলিকাতা, ৯২।৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।৵০ আনা মাত্র। এই পত্রিকাখানিতে বিবাহ, ধর্ম্ম ও সমাজনীতি বিষয়ে আলোচনা আছে। অধুনা সমাজে ঘটক সম্প্রদায়ের অত্যন্ত অভাব। নিম্ন শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশ স্থলেই ঘটকের স্থান অধিকার করিয়াছে। এই সকল স্বার্থান্ধ অশিক্ষিত লোকদিগের দ্বারা অনেকেই অনেক সময় প্রতারিত হন। সেই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত এই পত্রিকায় সকল ধর্ম্ম, শ্রেণী ও জাতির পাত্র পাত্রীর রূপ ও গুণ বর্ণনা করিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন ও বিবাহকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা অতি আনন্দের বিষয়। বঙ্গসমাজে বিবাহব্যাপার অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, শিক্ষিত লোকেরা মধ্যস্থ হইয়া যদি সৎপাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন ও ব্যয় সংকুলানের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইবে সন্দেহ নাই। এই পত্রিকা বহু দিবস হইল প্রকাশিত হইয়া, ইহার স্বত্বাধিকারী নিরুদ্দেশ হওয়ায় এতদিন বন্ধ ছিল, এক্ষণে পুনরায় রীতিমত প্রকাশিত হইবে আশা করা যায়।

২। প্লেগ-সংহিতা বা আর্য্যস্বাস্থ্যবিধান।—শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। এই পুস্তকে প্লেগের উৎপত্তি, প্লেগ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত, সভ্যতার সহিত মহামারির আবির্ভাব, প্লেগের টীকা সঙ্গত কি না, প্লেগের ঔষধ, ইত্যাদি নানা বিষয় যত্নের সহিত শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক মত সংগ্রহ করিয়া আলোচিত হইয়াছে। ইহা সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে অতীব হিতকারী গ্রন্থ। বহুদর্শী গ্রন্থকার হিন্দুর জ্যোতীষ বিজ্ঞানাদির বহুলশাস্ত্র সমালোচনা পূর্ব্বক ইহাতে অনেক প্রয়োজনীয় কথা লিখিয়াছেন, সে সকল কথা সর্ব্বসাধারণের বিশেষরূপে পড়িবার ও বুঝিবার বিষয়, এবং তাহা পড়িলে ও বুঝিলে যথাশক্তি তদনুরূপ জীবনপ্রণালী অবলম্বন করিলে অতি উপাদেয় ফললাভ হইতে পারে।

৩। অঞ্জলি—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত অভিনব গীতিকাব্য, কলিকাতা ৩৬ নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র। জীবেন্দ্র বাবু সাহিত্য জগতে অপরিচিত নন। তাঁহার এই অঞ্জলি প্রাপ্তে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। পুস্তিকাখানি ভক্তি, প্রীতি প্রেম ও সম্মিলন এই চারিভাগে বিভক্ত। কবিতাগুলি কবিহৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাস। রচনা সরল ও মধুর। প্রতি পদ্যেই

গ্রন্থকারের মধুর প্রেম ও ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইতেছে। ইনি নব নব রত্নদামে আমাদের মাতৃভাষাকে শোভিত করুন।

বামারচনা।

প্রার্থনা।

মা!

আর চাহিব না,
চাহিতে দিও না,
চাহিবার কিছু দেখনা ভবে,
বুঝেছি বাসনা,
পূরে না পূরে না
আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি কভু না হবে।
কর্ম্ম ভোগ কত,
ভুক্তি নানা মত,
হর্ষে বেঁধেছিনু সুখের বাসা,
সারাটী জীবন,
চাহিয়াছি ধন,
চাহিয়াছি সুখ, যশের আশা।
চাহি স্নেহ মান,
প্রেমে প্রতিদান,
চাহিতে চাহিতে জীবন গেল,
নিত্য নানা মত,
চাহিতেছি কত,
বাসনা কই মা ফুরায়ে এল?
মিটে এক আশা,
আবার পিপাসা,
শুধুই পিয়াসে দহিল প্রাণ,
চাহিতেছি যত,
দিতেছ সতত,
তথাপি অতৃপ্তি, দুঃখেরি স্থান।

বুঝেছি এবার,
স্বভাব আমার,
কিছুই রাখিনি জগত-মাঝে,
অভ্যাসের ফলে,
অতৃপ্তির বলে,
দেহি দেহি শুধু সকল কাজে।
চাহিবার ফল,
অতৃপ্তি কেবল,
জানিয়া বুঝিয়া কামনা তবু,
যত ঢাল সুধা,
মেটে না এ ক্ষুধা,
এবার চাহিলে দিও না কভু।
হতাশ হইয়ে,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
মাগো! অশ্রুজল ফেলেছি কত,
কৃতঘ্ন এ প্রাণ,
ভুলে, তোর দান,
তোমারে অবজ্ঞা করেছে শত।
তথাপি তোমার,
করুণা অপার,
বরদাত্রীরূপে দিয়েছ দেখা,
গেছে অবসাদ,
পূর্ণ আজি সাধ,
মুছাও এবার করম-লেখা।

কিছু চাহিব না,
চাহিতে দিও না,
চাহিবার কিছু যেথনা ভবে,
অতৃপ্ত হৃদয়
শান্ত কভু নয়,
বাসনা ঘুচিলে প্রশান্ত হবে।

কোকিল

(ইংরাজী হইতে অনুবাদিত)

১

এস হে কোকিল আজি
বসন্তের দূত সাজি
নিকুঞ্জ কাননে তুমি সুবেশী অতিথি,
দিয়াছেন বিশ্বপতি
তোমারে আসন পাতি,
কানন গাইছে তব আগমনী-গীতি।

২

'ডেসি' ফুটি থরে থরে
প্রান্তর শোভিত করে
অমনি শ্রবণে তুমি ঢাল স্বরধারা,
কেমনে নির্দ্দিষ্টক্ষণ
জানি কর আগমন ?
পথ দেখাইয়া দেয় বুঝি কোন তারা ?

৩

নিকুঞ্জ মাঝারে থাকি
ডাকে নানাজাতি পাখী,
শুনি সে মধুর গীতি জুড়াল শ্রবণ,
চিরানন্দময় তুমি,
তোমা সনে আজ আমি
সমাদরে বসন্তেরে করি সম্ভাষণ।

৪

হবে কানন ভিতরে,
বালক ভ্রমণ করে
প্রস্ফুটিত 'প্রিমরোজ'-চয়ন-মানসে,
ক্ষণেক হয়ে স্তম্ভিত
শুনিয়ে তব সঙ্গীত
অনুকারি ওই স্বর গায় সে হরষে।

৫

(এই) গীতি-পূর্ণ উপত্যকা
ত্যজি যাও মধুসখা
রবি শস্য হয় যবে মুকুলে শোভিত,
অন্য কোন বসন্তেরে
সম্ভাষিতে সমাদরে
অন্যত্র অতিথিবেশে হও উপনীত।

৬

তোমার আকাশ ভাই !
নিরমল সর্ব্বদাই
সদাই হরিতবর্ণ নিকুঞ্জ তোমার ;
তোমার সঙ্গীতে ভাই !
বিষাদের কণা নাই
তোমার বরষে নাই শীতের সঞ্চার।

৭

তোমা সনে নিরবধি
উড়িবার শক্তি যদি
থাকিত, অন্যান্য পক্ষে আমি পিকবর !
তোমা সনে বর্ষে বর্ষে
সারা ধরা ভ্রমি হর্ষে
হইতাম বসন্তের চির-সহচর।

২।৩ মদন মিত্রের লেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 536. April, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫৩৬ সংখ্যা। { চৈত্র, ১৩১৪। এপ্রেল, ১৯০৮। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পশ্চিমাঞ্চলে বৈশ্য কন্‌ফারেন্স — এ বর্ষের বৈশ্য কন্‌ফারেন্স মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকল্পে উক্ত সভায় এবার অনেকগুলি উপাদেয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। বৈশ্যজাতি নানা শ্রেণী, নানা সম্প্রদায়ে ও নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। তাহাদের শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত সমস্ত পার্থক্য দূরীভূত করিয়া, যাহাতে সমগ্র বৈশ্যজাতি একতাসূত্রে গ্রথিত হয়, যাহাতে সামাজিক কুপ্রথা সকল অপসৃত হয়, যাহাতে সামাজিক ও পারিবারিক, ধর্ম্মঘটিত বা বিষয়ঘটিত বিবাদ-বিসংবাদের সালিসী দ্বারা নিষ্পত্তি হয়, যাহাতে সংস্কৃত ও হিন্দি শিক্ষার বিশিষ্টরূপ উন্নতি হয়, যাহাতে বালিকারা ও গৃহিণীরা অবস্থাগত সুশিক্ষা লাভ করিয়া সামাজিক ও পারিবারিক উন্নতির সহায়তা করিতে পারেন, যাহাতে বিধবারা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিতা ও বিবিধ শিল্পাদি বিদ্যায় শিক্ষিতা হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহপূর্ব্বক সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, সেই সকল সদনুষ্ঠানই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বৈশ্যজাতিমধ্যে বিবাহাদি উৎসবে বারবনিতার নৃত্যগীতাদি-প্রথা প্রচলিত আছে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলে সমবেত হইয়া ইহা দর্শন ও শ্রবণ করেন, এই কুপ্রথার উচ্ছেদ বিষয়ে, এই বৈশ্য-সভা এবার বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বৈশ্য বালকেরা যাহাতে শিল্প বাণিজ্যাদি বিষয়ে পাশ্চাত্যজাতির অবলম্বিত বৈজ্ঞানিক সমুন্নত প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্বদেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে পারে, ধনাগমের নব নব পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারে, তৎপক্ষেও এই সভার আন্তরিক উদ্যোগ। ঈশ্বর এই সভার সাধু উদ্দেশ্য সফল করুন।

ভারতের সর্ব্বত্রই এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসৃত হউক।

ভারতের সর্ব্বজনীন বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়—আজি মঙ্গলময়ের কৃপায় দেবী এনি বেসান্তের মহীয়ান্ সঙ্কল্প ফলোন্মুখ হইল। বহুদিনাবধি তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছিল যে,—ভারতবর্ষে একটী জাতীয় বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক, এবং উহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভার ভারতসন্তানগণের হস্তে ন্যস্ত হউক। হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান্, ব্রাহ্ম, শিখ, জেরোষ্ট্রিয়ান্ প্রভৃতি যে জাতির যত বিদ্যালয় আছে, সমস্তই অবিরোধে সম্মিলিত হইয়া একই উদ্দেশ্যে এই বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটী অঙ্গস্বরূপ হউক। ভারতের মহোন্নতিকল্পে সর্ব্বপ্রকার সম্প্রদায়ের জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সাধনা ও চিন্তার সামঞ্জস্য ও সঙ্গমক্ষেত্র এই বিশ্ববিদ্যালয় হউক। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নেতারা সমপ্রাণ সহোদরের ন্যায় সৌহার্দ্দে মিলিত হইয়া ইহার উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হউন।

এ ব্যাপার অসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার "অকিঞ্চনের নিবেদন" নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন,—"আমরা সকলেই এক মায়ের (জন্মভূমির) সন্তান। এই ভারতবসুন্ধরায় আমাদের ঈশ্বরদত্ত—পৈতৃক ও মাতৃক স্বত্ব, জন্মাধীন স্বত্ব, স্বাভাবিক স্বত্ব, আমাদের কৌলিক ও মৌলিক স্বত্ব; আমাদের অস্থি, মাংস, মজ্জা, শোণিত, প্রাণময় ও অন্নময় কোষ, সকলি এই মাতৃভূমির উপাদানে সৃষ্ট ও পুষ্ট। এই ভূতধাত্রী যখন আমাদের সাধারণ জননী এবং এই ভূতধাত্রীর স্রষ্টাও যখন সেই—"একমেবাদ্বিতীয়ম্", তখন আমরা সকলেই এক পরিবার। অতএব অসংখ্য বিষয়ে আমাদের অসংখ্য ভেদ থাকিলেও, আমাদের সাধারণ সন্ধিস্থল বা সংযোগভূমি—ঈশ্বর ও জন্মভূমি। ঈশ্বরে ও জন্মভূমিতে যদি সকলের অনুরাগ অচল হয়; জন্মভূমির সমুন্নতিই যদি সকলেরি অদ্বৈত লক্ষ্য ও অদ্বৈত সাধনা হয়; আমরা যদি ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া একই—মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হই, তবে গন্তব্য স্থানে পৌছিবই; পথে কোনও বিঘ্নবাধা আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না। যেমন সাগরোন্মুখী নদীরা নানা পথে প্রধাবিত ও নানা বাধায় প্রতিহত হইয়াও, সেই মহাসাগরেই পতিত হয়, তেমনি, আমরা ত্রিশ কোটি, সমপ্রাণ ও একলক্ষ্য হইয়া চলিলে, সহস্র বাধা সত্বেও আমাদের সিদ্ধিক্ষেত্র—সেই মহাসঙ্গমে গিয়া মিলিব।"

বেসান্ত দেবী এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্য যাহা করিয়াছেন ও যাহা করিতেছেন তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ইংলণ্ডেশ্বর, তদীয় প্রধান মন্ত্রী, ভারতসচিব, ভারত গবর্ণর, ভারতের নানা সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান নেতা প্রভৃতিকে তিনি নিজ উদ্দেশ্য জানাইয়া তাঁহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিয়াছেন। ঈদৃশ সঙ্কল্পে অনুমোদন না করিয়া কেহই থাকিতে পারেন না।

এনি বেসান্ত বক্তৃতাকালে এই বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—সমগ্র ভারতবর্ষ যাহাতে ভারতবাসীর স্বায়ত্বশাসনতন্ত্রে পরিণত হয়, তাহার জন্ম এখন হইতে আমাদিগকে উদ্যোগী হইতে হইবে, কেননা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, সমগ্র জগতের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে একটী বিশ্বজনীন মহাসম্মিলনের শুভদিন আসিতেছে। এ সময় যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের শাসনভার ভারতবাসীর হস্তে দেন, তবে এই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই উক্ত মহাসম্মিলনের প্রথম পথপ্রদর্শকরূপে চিরকাল পূজিত হইবেন এবং ব্রিটিশ জাতির পূণ্যমহিমা এই জগতে অক্ষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যে স্বাধীনতার উপাসক তেজীয়ান্ ব্রিটিশ জাতির উদ্যমে এমেরিকার ঘৃণিত দাসত্বপ্রথা নিবারিত হইয়াছে, যাঁহাদের শিক্ষায় ও আদর্শে আজি এদেশে স্বদেশভক্তির নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,এ অধম পতিত মহাজাতির উদ্ধারসাধন তাঁহাদেরি সাধ্যায়ত্ত।

এ জগতে দেবী আনিবেসান্তের উদয়, ভারতের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপায় ফল। কোটি কোটি ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তিনি অনন্তকাল জীবিত থাকিবেন। এ পতিত জাতির উদ্ধারসাধনের জন্য তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ পতিতপাবনী মহাশক্তিরূপে প্রেরিতা।

দান—বহরমপুরের স্বনামখ্যাত জমিদার রাজা যোগেন্দ্র নারয়ণ রাও সাহেব বহরমপুর হাঁসপাতালে বিনা ব্যয়ে রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য ৫০,০০০ হাজার টাকা ও বহরমপুর কলেজে এণ্ট্রান্স ও এফ এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের বৃত্তির জন্য ২০,০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ শুশ্রূষাকারিণী নাইটিঙ্গেল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদিগের সেবা করায় ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভক্তি উপহার স্বরূপ তাঁহাকে ৭॥০ লক্ষ টাকা দান করেন। তিনি সেই টাকা নিজে গ্রহণ না করিয়া তাহা নাইটিঙ্গেল হোম নির্ম্মাণের জন্য দান করেন। সম্প্রতি লণ্ডন সহরে নাগরিক অধিকার পত্র একটী সুবর্ণ-পাত্রে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে দান করা হয়। তিনি সেই পাত্র গ্রহণ না করিয়া তাহার মূল্য ২৮০০্ টাকা শুশ্রূষাকারিণীদের আশ্রমে দান করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে অশান্তি—স্বদেশভক্ত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কারামুক্তি উপলক্ষে মান্দ্রাজে টিউটিকরিনের অধিবাসীরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য অনেক দোকান সুসজ্জিত করিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে কোনও দোকানদারকে বেত্রাঘাত করায় জনসাধারণ ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর লোষ্ট্রনিক্ষেপ করে এবং পুলিশও লোকের উপর গুলি চালায়। ফলে কতকগুলি লোক হত ও আহত হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ সভা—পশ্চিমাঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তত্রত্য দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য গত ১৮ই মার্চ্চ

কলিকাতা টাউনহলে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। ভারত-সম্রাট্ দুর্ভিক্ষ ধন-ভাণ্ডারের অভিভাবকের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

তুলসীদাস গৃহত্যাগী হইয়া নানাস্থান ভ্রমণকরত কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রত্যহ মণিকর্ণিকাতীর্থে স্নান করিয়া শিবের চরণে প্রার্থনা করিতেন,—হে দয়াময় বিশ্বেশ্বর! তুমি আমাকে রামভক্তি দান কর। নরহরি নামে এক মহাপ্রভাব সাধু তুলসীর ঐকান্তিকী ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তুলসীকে আশা ও উপদেশ দান করিলেন। নরহরির কৃপায় তুলসী সাধনাবিষয়ে অনেক গূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। তাঁহার নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে নগরের বাহিরে গিয়া শৌচাদি সম্পন্ন করিতেন। শৌচান্তে জলপাত্রে যে জলটুকু অবশিষ্ট থাকিত, ফিরিবার সময় সেই জল পথের এক বৃক্ষমূলে ঢালিয়া দিতেন। একদিন সেই বৃক্ষমূলে আসিয়া দেখিলেন,—পাত্রে জল নাই। বৃক্ষে জল দেওয়া হইল না, ভাবিয়া একটু দুঃখিতভাবে দাঁড়াইলেন, এমন সময় বৃক্ষ হইতে এক ভূতযোনি বলিয়া উঠিল,—"আজি জল দিতে না পারায় দুঃখিত হইও না। আমি এই বৃক্ষে বাস করি, তোমার প্রদত্ত জল আমি অলক্ষ্যে প্রত্যহ পান করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করি। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" তুলসী কাতরস্বরে তাহার নিকট প্রার্থনা করিলেন,—"হে মহাপুরুষ! আপনাকে নমস্কার! আপনি দয়া করিয়া আমাকে এই বর দিন, যেন আমি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করি।" প্রেতযোনি কহিল,—"সে ক্ষমতা আমার নাই; তবে তোমাকে এক উপায় বলিতেছি শুন। এই স্থানের কিছু দূরে কর্ণঘণ্টা নামক স্থানে এক মন্দিরে প্রত্যহ বৈকালে রামায়ণ কথা হইয়া থাকে। এক মলিনবস্ত্রধারী কুরূপ পুরুষ প্রত্যহ তথায় রামায়ণ শুনিতে আসেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে তথায় আসিয়া সর্ব্বশেষে চলিয়া যান। তিনিই সাক্ষাৎ হনুমানজী। তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও, তিনি কৃপা করিলেই তোমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে।" তুলসীদাস নিরূপিত সময়ে কর্ণঘণ্টাদেবালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—পূর্ব্বোক্তরূপ একটী পুরুষ তথায় সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইলেন, এবং কথারম্ভ হইলে, জনতা হইতে একটু দূরে বসিয়া ভক্তিগদগদভাবে রামায়ণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কথাভঙ্গের পর সেই পুরুষ সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন, তুলসীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। নির্জ্জনে তাঁহাকে একাকী পাইয়াই তুলসী সরোদনে

তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন, এবং রামদর্শনার্থে কাতরভাবে তাঁহার কৃপা-ভিক্ষা করিলেন। সেই পুরুষ তুলসীকে প্রত্যাখ্যান করিতে নানা কৌশল করিতে লাগিলেন, কিন্তু তুলসী কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না, দৃঢ়ভাবে তাঁহার চরণ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—আপনি দয়া করিয়া রাম-দর্শনের উপায় যতক্ষণ না করিবেন, ততক্ষণ কিছুতেই আপনার চরণ ছাড়িব না। কাশীধামে কোনও ভূতযোনি আমাকে আপনার সন্ধান জানাইয়া বলিয়াছেন,—তিনি যতক্ষণ না রামদর্শ-নের উপায় করিবেন, ততক্ষণ তাঁহার চরণ ছাড়িও না। তখন হনুমান্‌জী তুলসীকে রামমন্ত্র দান করিয়া কহিলেন, —তুমি চিত্রকূটে গমন করিয়া একান্ত-ভাবে এই মন্ত্র জপ কর, ঐ স্থানেই তুমি রামচন্দ্রের দর্শন পাইবে। তুলসী চিত্র-কূটে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

একদা তুলসী চিত্রকূটে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন,—একটী হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধনুর্ব্বাণ হস্তে দুইটী আশ্চর্য্যরূপ রাজকুমার অশ্বারোহণে চলিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী অপূর্ব্ব শ্যামবর্ণ ও অপরটী অপূর্ব্ব গৌরবর্ণ। তুলসী চমকিত হইয়া দেখিতে দেখিতে ঐ দুই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। তুলসী মুগ্ধ হইয়া দেখিলেন বটে, কিন্তু উঁহারাই যে, রাম-লক্ষ্মণ, তখন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। অনন্তর হনুমান্‌জী পুনরায় তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন,—তুলসি! তুমি চিত্রকূটে কিছু দেখিলে? তুলসী কহি-লেন,—হাঁ! চিত্রকূটে দুই অপূর্ব্ব কুমার দেখিলাম; কিন্তু তাঁহাদিগকে মৃগয়াশীল জানিয়া আর সে দিকে দৃষ্টি রাখি নাই। হনুমান্ কহিলেন,—হায় হায়! আরাধ্য বস্তুকে তুমি সম্মুখে পাইয়াও দেখিলে না? চিনিলে না? উঁহারাই রাম-লক্ষ্মণ। এ কলিযুগে দেবদর্শন বারংবার ঘটে না। তখন তুলসী হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগি-লেন,—"আমি কি হতভাগ্য! কি কুকার্য্য করিলাম! আমি জাগিয়া ঘুমাই-লাম! চিন্তামণি সম্মুখে পাইয়াও পলক-মধ্যে হারাইলাম! যখন চলিয়া গেল, তখন ঘুম ভাঙ্গিল!"

"যখন চলিয়া গেল, তখন ঘুম ভাঙ্গিল" —তুলসীর এ কথাটীর যাথার্থ্য মানবগণ অহরহঃ অনুভব করিতেছে, তথাপি কাহারও ঘুম ভাঙ্গিতেছে না, "কিমাশ্চর্য্য-মতঃপরম্।" এই জন্যই বলিয়া থাকে,— "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানে না।" সময় ও সুযোগ থাকিতে মানব যদি বুঝিয়া চলিত, যদি যথাকালে স্বকর্ত্তব্য প্রাণ ভরিয়া সম্পন্ন করিত, তবে আপন অনুতাপের তুষানলে আপনি দগ্ধ হইত না, তাহার আশাময় হৃদয় ও মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া প্রতপ্ত নিশ্বাস-পরম্পরা উত্থিত হইয়া তাহাকে শোষণ করিত না।

"চলিয়া গেলে ঘুম ভাঙ্গে"—অধি-কাংশ মানবের এই দশা! যখন প্রাণের

পরমারাধ্য ত্রিলোকীদুর্লভ পিতা-মাতা এ জগতে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন, জানিনা, কি এক মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম! তখন মনে হইত, আমার এই অবস্থাই স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী, এ জীবন এরূপেই কাটিবে। কিন্তু হায়! যে দিন তাঁহারা চলিয়া গেলেন, সেই দিন তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলাম. সেই দিন পিশাচী মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিল। এখন মনে হয়, আবার যদি একটীবার তাঁহাদের দেখা পাই, তবে কি করি? আমার এই দেহ-মনপ্রাণ ও আত্মা একসঙ্গে বাটিয়া তাঁহাদের চরণে লেপন করি; যুগপৎ উভয়ের চরণ বুকে করিয়া মরিয়া যাই; যুগবৎ উভয়ের গলা ধরিয়া সেই যুগল বক্ষে লয় হইয়া যাই; অথবা অনন্তকাল অনিমিষনেত্রে তাঁহাদের অভয়, অমৃতময়, সর্ব্বদুঃখহারী, প্রাণারাম রূপ দর্শন করি; যুগপৎ উভয়ের কপোলে কপোল সংলগ্ন করিয়া, মা-মা-বাবা-বাবা!” বলিয়া ডাকিতে থাকি; অথবা, তাঁহারা যাহা ভালবাসেন, যাহা করিলে তুষ্ট হন, নিরন্তর তাহাই করি, আর বলি,—আমি তোমাদিগকে ফেলিয়া কোথাও যাইব না, পলকের জন্যও তোমাদিগকে চক্ষুর অন্তরাল করিব না, প্রাণান্তেও তোমাদের অবাধ্য হইব না, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইও না। গভীর নিশীথে যখন সমস্ত বিশ্ব নিস্তব্ধ, তখন আমি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদি ও তোমাদিগকে ডাকি, তোমরা কি তাহা শুনিতে? আমার অশ্রুধারায় সমস্ত শয্যা সিক্ত হয়, আমার আর্ত্তনাদে নিঃশব্দা নিশীথিনী চমকিত হয়, অন্ধকারেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তোমরা কি তাহা জানিতে পার?

দয়াময় পিতঃ! দয়াময়ি মা! তোমরা আজি নিরাময় অশোক ব্রহ্মলোকে দিব্য রূপে ও দিব্য তেজে প্রদীপ্ত হইয়া বিহার করিতেছ। তোমরা আমার অন্তঃসাক্ষী; আমার মনের কথা, যাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, তাহা জানিতেছ। সেই সকল পূর্ব্ব স্মৃতি, যাহা আমার আত্মার সহিত জড়িত হইয়া আছে, সেই সকলের উন্মাদকর উত্তেজনা আমাকে অভিভূত করিতেছে; চাপিবার জন্য ভুলিবার জন্য যতই চেষ্টা করি, সে সকল স্মৃতি ততই প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। সে সকল স্মৃতির আদি, অন্ত ও মধ্য তোমরাই। আমি উদ্‌ভ্রান্ত ও উন্মত্ত হইয়া অহোরাত্র সেই স্মৃতিময় রাজ্যেই বাস করিতেছি। তোমাদের প্রস্থানের পর এই সুদীর্ঘ কালে এ জীবনে কত বিপ্লব, কত পরিবর্ত্তন, কত সংঘর্ষ ঘটিল, কিন্তু সে সকলি ভুলিয়া যাই; মনে হয় যেন,—মধ্যে কোনও ব্যবধান পড়ে নাই, সেই আমি ও সেই তোমরা অবিচ্ছেদে বিদ্যমান। সেই স্থান, সেই ক্ষণ, সেই সব কথা, সেই কার্য্য অবিচ্ছেদে বিদ্যমান। সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান, সেই উৎসব, সেই আনন্দ অবিচ্ছেদে বিদ্যমান। যেন সেই আমি, সেই তোমরা, সেই সব আত্মীয় অবিচ্ছেদে বিদ্যমান। আমি সেই স্মৃতি ও সেই

কল্পনায় ডুবিয়া গিয়াছি, যেন সেই বয়সে ও সেই অবস্থায় অবিকল রহিয়াছি। কিন্তু হায়! মরীচিকার ন্যায় সেই কল্পনা-কুহক যে মুহূর্তে অপসৃত হয়, তখনি হৃদয় তুষানলে দগ্ধ হইতে থাকে।

এ যে কি যাতনা! বলিতে পারি না, এ বেদনা কোন্ স্থান হইতে উঠিতেছে তাহা হাত দিয়া দেখাইতে পারি না, এ পীড়ার ঔষধ নাই। তুলসীদাস! তুমি যে সাধনার বলে তোমার হারানিধিকে আবার পাইয়াছিলে, এবং পাইয়া আর হারাও নাই, এ হতভাগ্যকে সেই সাধনা, সেই মহামন্ত্র শিখাইয়া দাও।

তুলসীর মর্ম্মভেদিনী কাতরতা দেখিয়া হনুমান্ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, —"বৎস! অভীষ্ট-দর্শনে তোমার যেরূপ প্রাণশোষিণী তৃষ্ণা, তুমি আবার সেই দয়াময়ের দর্শন পাইবে।" ইহা বলিয়াই হনুমান্ অন্তর্হিত হইলেন।

অভীষ্ট বস্তু ইহলোকে বা পরলোকে, স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে, যেখানেই থাকুক, সে বস্তুটী দেবতা, মনুষ্য বা যে যোনি প্রাপ্ত হউক, তাহা সেই অদ্বৈত পরমাত্মার সহিত অনুস্যূত।

"যস্মিন্নিমানি ভূতানি তিষ্ঠন্তি চ বিশন্তি চ।
গুণভূতানি ভূতেশে সূত্রে মণিগণাইব॥
যস্মিন্ নিত্যে ততে তন্তৌ দৃঢ়ে স্রগিব তিষ্ঠতি।
সদসদ্ গ্রথিতং বিশ্বং বিশ্বাঙ্গে বিশ্বকর্ম্মণি॥"

—হারসূত্রে রত্নরাজির ন্যায়, সেই ভূতনাথে এই ভূতমণ্ডল প্রবেশ ও অবস্থিতি করিতেছে, অনন্ত বিশ্বমণ্ডলের নিত্য ও সুদৃঢ় সূত্ররূপে সেই বিশ্বকর্ম্মাই সর্ব্বত্র বিস্তৃত। বিশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলি তিনি; সৎ অসৎ সকল বস্তু তাঁহাতেই গ্রথিত। জাগতিক সমস্ত পদার্থের আত্মার আত্মায় কি এক নিগূঢ় ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে, তাহার তত্ত্বনিরূপণ মনুষ্যশক্তির অতীত। একান্তভাবে তন্ময় হইয়া চিন্তা করিলে, পরলোকগত আত্মীয়ের মূর্ত্তি সম্মুখে দেখা যায়, তাঁহার সঙ্গে ইচ্ছামত কথাবার্ত্তাও ঘটিয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা, প্রত্যক্ষের অপলাপ করা যায় না (১)।

ভক্ত একান্তভাবে ডাকিলে, ভগবান্ অরূপ হইয়াও, ভক্তের কাতর প্রার্থনায়, তাহার ধ্যেয় মূর্ত্তিতেই তাহাকে দেখা দিয়া থাকেন। তিনি ভক্তের বাঞ্ছাকল্প-তরু। কিন্তু সে ভক্তি ও সে তৃষ্ণা চাই। স্বয়ং বারংবার এ সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই তুলসী লিখিয়াছেন :—

"অজ অদ্বৈত অনাম অলখরূপ গুণরহিত জো।
মায়াপতি সোই রাম দাসহেতু নরতনু ধরেউ॥"

—যিনি অজ, অদ্বৈত, অনাম, অব্যক্তরূপ, গুণরহিত, সেই মায়াপতি রাম ভক্ত দাসের

(১) এই প্রবন্ধলেখক কয়েকবার তাহার কয়েকটী পরলোকগত আত্মীয়কে দেখিয়াছে এবং তাঁহাদের নিকট জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছে।

জন্য নরদেহ ধারণ করেন। শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরে এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে;—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।"

—সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি নিজ অদ্বৈত স্বরূপকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভগবান্ অনন্ত ভক্ত-মণ্ডলীর "আদুরে গোপাল," তাই তাঁহার নামেরও অন্ত নাই, ভাবেরও অন্ত নাই, রূপেরও অন্ত নাই। যে ভক্ত যখন যে নামে, যে ভাবে, যে রূপে তাঁহাকে আহ্বান করে, ভক্তবৎসল হরি সেই নামে, সেই রূপে ও সেই ভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হন। তাঁহার সেই সহস্রপ্রকার রূপ ও নাম, একই ভক্তি-সাগরের বিবর্ত্ত, অর্থাৎ উপাধিভেদ মাত্র। কালীই বল আর দুর্গাই বল, হরিই বল আর শঙ্করই বল, রামই বল আর কৃষ্ণই বল, যে নামে ডাক না কেন, তোমার ডাক প্রকৃত ভক্তির ডাক হইলে, তোমার ধ্যান আন্তরিক হইলে, সেই ভক্তদুঃখহারী হরি অবশ্যই তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন। তিনি ভক্তেরই ভগবান্, ভক্তের হৃদয়পীঠে তাঁহার নিত্য অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বৈকুণ্ঠধাম।

নিজ প্রাণারাম মূর্ত্তিতে ভগবদ্দর্শন, তুলসীর জীবনে বহুবার ঘটিয়াছিল। তিনি বৃন্দাবনে গিয়া এ ঘটনা অনেককে প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। তিনি ব্রজপুরীর চৌরাশী ক্রোশ পরিসর পরিভ্রমণ করেন; তাঁহার হৃদয়ে কেবল রাম ধ্যান এবং মুখে কেবল "সীতা-রাম।" কিন্তু বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র "রাধাকৃষ্ণ" ভিন্ন, কাহারও মুখে অন্য নাম নাই। তুলসী একদা বৃন্দাবনে এক কুটীরে বসিয়া আছেন, এক বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিল,—আসুন্ গোঁসাইজী! আপনাকে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখাই। ইহা বলিয়া সে তুলসীকে মদনগোপালের মন্দিরে লইয়া গেল। তাঁহাকে উপহাস করিবার জন্য অনেকে তাঁহার সঙ্গে চলিল। তুলসী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—বেদিকার উপর মদনগোপালমূর্ত্তি মুরলীহস্তে বিরাজমান। তুলসী বলিয়া উঠিলেন;—

"কহা কহোঁ ছবি আজকী, ভলে বনে হো নাথ!
তুলসী মস্তক জব নবৈ, ধনুষবাণ লো হাথ॥"

—অহো! নাথ! তোমার এ মূর্ত্তি যতই সুন্দর হউক না কেন, তুলসী তোমার চরণে মস্তক নত করিবামাত্র, তোমাকে ধনুর্ব্বাণধারী রামচন্দ্র হইতে হইবে। ইহা বলিয়া তিনি সেই মূর্ত্তির পদে পতিত হইলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল;—বেদিকায় সে মদনগোপাল মূর্ত্তি নাই, সেইস্থানে অপূর্ব্ব দূর্ব্বাদলশ্যাম, ধনুর্ব্বাণধারী রঘুনাথ রামচন্দ্র বিরাজমান। তখন, "জয় রাম!—জয় জয় তুলসীদাস।" ইত্যাদি আনন্দনাদে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইল। এই ঘটনার পর তত্রত্য বৈষ্ণ-

বেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনার কি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি নাই? তুলসী হাস্য করিয়া কহিলেন,—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে হ্যভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥"

—শ্রীনাথ, জানকীনাথ, অভেদ উভয়,
দোঁহে এক পরমাত্মা নাহিক সংশয়;
তথাপি সে সীতানাথ কমললোচন—
রাম মম হৃদয়ের সরবস্ব ধন।

ক্রমে তুলসীর অলৌকিকী শক্তি ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলীর কথা দিল্লীশ্বর সাজাহান বাদসাহের কর্ণগোচর হইল। বাদসাহ তুলসীকে ঐন্দ্রজালিক (বুজরুক) ভাবিয়া, তামাসা দেখিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তুলসী সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইলেন। বাদসাহ তাঁহাকে বলিলেন,—শুনিলাম, তুমি বুজরুক; তোমার বুজরুকি কিছু আমাকে দেখাও। তুলসী যথোচিত সম্মান ও বিনয় সহকারে কহিলেন,—আমি বুজরুকি জানিনা, আমি কেবল রামনাম জানি, আমার কাছে আশ্চর্য্য পদার্থ কিছুই নাই। বাদসাহ কহিলেন,—কে তোমার সে রাম? তাহাকে দেখাও, নহিলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকিবে না। তুলসী নীরব রহিলেন। বাদসাহ ক্রোধান্ধ হইয়া আজ্ঞা দিলেন,—এই বদমাসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে অনাহারে ফেলিয়া রাখ। তুলসী প্রফুল্ল মনে কারাগারে নীত হইলেন। সম্রাটের আদেশে ভৃত্যেরা তুলসীর উপর লোমহর্ষণ অত্যাচার করিতে লাগিল। তুলসী বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তিনি নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় ধ্যানমগ্ন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে এক ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল। অকস্মাৎ অদ্ভুতমূর্ত্তি, মহাকায় লক্ষ লক্ষ বানর আসিয়া দিল্লী আক্রমণ করিল। নগরের প্রাচীর, দুর্গ, তোরণ, অট্টালিকাসকল চূর্ণ করিয়া ফেলিল। নগরবাসীরা ভয়বিহ্বল হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। বাদসাহের দুর্গতির একশেষ হইল। তখন বাদসাহের মন্ত্রিগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাদসাহকে নিবেদন করিল,—হে রাজরাজেশ্বর ঈশ্বরকল্প দিল্লীশ্বর! আপনি যে হিন্দু ফকিরকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, স্বয়ং হনুমানজী তাঁহার গুরু। সেই দুর্জ্জয় মহাবীর হনুমান্ এ ভীষণকাণ্ড বাঁধাইয়াছে। আপনি অবিলম্বে ঐ ফকিরকে সম্মানপূর্ব্বক কারামুক্ত করুন, নহিলে আরো সর্ব্বনাশ ঘটিবে। বাদসাহ তখন নিরুপায় হইয়া তুলসীকে কারামুক্ত করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তুলসী বাদসাহকে বলিলেন,—আপনি আমার আরাধ্য দেবতা রামচন্দ্রকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন; প্রথমেই তিনি নিজে না আসিয়া কতিপয় অনুচরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ বানরের দৌরাত্ম্যে দিল্লীনগর একপ্রকার উৎসন্ন হইয়াছিল। তুলসীদাস বাদসাহের নিকট বিদায়কালে তাঁহাকে প্রাচীন দিল্লীনগর

পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, এজন্য বাদসাহ পুরাতন নগর পরিত্যাগ করিয়া সাহজহানাবাদ (সাজাহানবাদ) নামক নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে বানরগণের এই উপদ্রবের কথা প্রসিদ্ধ কবি প্রিয়াদাস অতি ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

দিল্লীনগরে একদা কবিকুলসূর্য্য সুরদাস ও কবিকুলচন্দ্র তুলসীদাস, এ উভয়ের একত্র সমাগম হয়। সুরদাস কৃষ্ণভক্ত, তুলসী রামভক্ত। একদিন উভয়ে একসঙ্গে বসিয়া আছেন, এমন সময় বাদসাহের হস্তী ক্ষেপিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল। সুরদাস ভীত হইয়া এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন,—"ওহে তুলসি! আমার ঠাকুর নন্দদুলাল দুধের ছেলে, তিনি এ প্রকাণ্ড মত্ত হস্তী হইতে আমাকে রক্ষা করিতে অক্ষম। তোমার ঠাকুর রামচন্দ্র ধনুর্বাণধারী যুবা, তিনি তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ। অতএব আমি পলায়ন করিলাম, তুমি এখানে বসিয়া থাক।" তুলসী সুরদাসের ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া, স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। হস্তী তুলসীকে সম্মুখে দেখিয়া মহাক্রোধে তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল। হস্তী তাঁহার সম্মুখে আসিবামাত্র, অকস্মাৎ শূন্যপথে এক সাংঘাতিক বাণ আসিয়া হস্তীর মস্তক বিদীর্ণ করিল, হস্তী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর সুরদাস তথায় আসিয়া, সম্মুখে মৃতহস্তী দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—তুলসি! এ ব্যাপার কি? তুলসী কহিলেন,—কিছুই জানি না, আমি সম্মুখে কেবল ধনুর্দ্ধারী রামমূর্ত্তি দর্শন করিতেছি।

(ক্রমশঃ

আমরা কি চাই।

(৩)

বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আমাদের কি কি জিনিষ চাই, এবং আমাদের প্রধান প্রধান গুটিকতক অভাবের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইলেই হইবে না। কোন জীবকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার কি কি রোগ আছে তাহা জানিলেই পর্য্যাপ্ত হইল না। রোগের কোন প্রতিকার আছে কি না এবং যদি থাকে তাহা কি, এ জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের অবস্থা বড় শোচনীয়, রোগ বড় কঠিন। কিন্তু কোন রোগ আরাম হইবার নয় এ বিশ্বাস যদি আমার থাকিত, তাহা হইলে এ প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়াস করিতাম না। বিশেষ চেষ্টা করিলে এখনও আমরা বাঁচিতে পারি। তাহার জন্য আমাদের কি করা আবশ্যক নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

(১) লোকশিক্ষার বিশেষ বন্দো-

বন্ত করিতে হইবে। শিক্ষা সাধারণ হওয়া আবশ্যক। কি ধনী কি নির্ধন, কি ব্রাহ্মণ কি নিম্নতম জাতি, কি হিন্দু কি মুসলমান, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, জাতীয় উন্নতির জন্য সকলেরই শিক্ষার প্রয়োজন। সকলকেই যে, এক শিক্ষা পাইতে হইবে তাহা নয়। যাহাকে যেরূপ কাজ করিতে হইবে, তাহার শিক্ষা সেইরূপ হওয়া চাই। যদি আমরা এক জাতি বলিয়া গণ্য হইতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে যে কত কাজ করিতে হইবে তার ইয়ত্তা নাই। একটী কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। এ সব কাজে বরাতি চলে না। অন্যের উপর ভার দেওয়া চলে না। কাজ আমাদের নিজেদের করিতে হইবে। যাহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি হয়, এবং লোকের অন্নসংস্থান হয়, এরূপ শিক্ষা চাই। যাহাতে আমরা দেশজাত অধিকাংশ জিনিষ কাজে লাগাইতে পারি এরূপ শিক্ষা চাই। যাহাতে আমাদের সামান্য জিনিষের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে না হয়, এরূপ শিক্ষা চাই। দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে কতকগুলি ভাবুক ও চিন্তাশীল লোকের প্রয়োজন। সাধারণতঃ উচ্চ শিক্ষা না পাইলে লোকে উহা হইতে পারে না। সেই জন্য সুকুমার বিদ্যার আলোচনা আবশ্যক, উচ্চ দর্শন বিজ্ঞান ও গণিতের আলোচনা আবশ্যক, নানা ভাষার আলোচনা আবশ্যক, ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। বাহুল্যভয়ে বেশী কথা লিখিলাম না। কিন্তু দেশের সকল লোকে উচ্চশিক্ষা পাইতে পারে না। এবং সকলেরই ভাবুক হইলে চলে না। উচ্চশিক্ষা পাইতে যে কাহারও বাধা থাকিবে, একথা বলিতেছি না, কিন্তু কার্য্যতঃ দেশের অধিকাংশ লোকের উহা পাওয়া সম্ভবপর নয়। উহা বহু সময় ও অর্থ সাপেক্ষ এবং উহাদ্বারা সকল জাতির আবশ্যকীয় কাজ হয় না। সেই জন্য কার্য্যকরী শিক্ষার বিশেষ আবশ্যক, এবং বেশীর ভাগ লোকের শিক্ষা কার্য্যকরী হইলেই যথেষ্ট। ব্যবহারিক শিক্ষা আমাদের প্রধান অভাব। যাহাতে নগরে নগরে ব্যবহারিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা করিবার সময় হইয়াছে। কোথায় কিরূপ ব্যবহারিক শিক্ষার আবশ্যক, তাহা স্থির করিতে হইবে। কোন নগরে চামড়ার কাজ ভাল হইতে পারে। সেখানকার ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের উহা শিক্ষা দেওয়া মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। কোথাও রেশমের কাজ ভাল হইবার সম্ভাবনা। সেখানে উহা শিখাইবার বিশেষ বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। দেশ কৃষিপ্রধান; নানা স্থানে কৃষিবিদ্যা শিখাইবার বন্দোবস্ত হওয়া চাই। দুই চারিটী ভাল ব্যবহারিক কলেজ চাই। তাহা হইলে ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা সেখানে গিয়া তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার সুবিধা পাইবে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপিত করিতে হইবে, এবং যাহাতে পাঠার্থীরা কার্য্যকরী শিক্ষা পায়

তাহা দেখিতে হইবে। নগরে নগরে এবং গ্রামে গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় আবশ্যক। সেখানকার শিক্ষাও কার্য্যকরী হওয়া চাই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, হস্ত ও চক্ষুর শিক্ষা সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়। মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোকের নাটক উপন্যাস পড়িয়া কার্পেট বুনিয়া বা ইংরাজী সংস্কৃত প্রভৃতি সাহিত্যের আলোচনায় সময় কাটাইবার সুবিধা হইবে না। প্রায় সকলকেই সন্তানাদি লালনপালনের এবং গৃহস্থালীর ভার লইতে হইবে এবং অনেককেই তাদের স্বামীপুত্রের কাজে সাহায্য করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ত থাকিবেই, কিন্তু কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থাও বিশেষরূপ চাই। আমি এ কথা বলিতে চাই না যে, সংসার চালান ও গৃহস্থালীর ব্যাপার বিদ্যালয়ে ভাল করিয়া নাই হউক, মোটামুটি শিখান যাইতে পারে। শিক্ষা এরূপ হওয়া চাই যাহাতে স্ত্রীলোকদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয় এবং বিদ্যাটা নিতান্ত পুথিগত না হয়। শিক্ষা যদি ক্রিয়াসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শিক্ষার্থিনীদের পক্ষে সংসারের অনেক কাজ সোজা হইয়া পড়িবে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অন্য সকল দিকে সুবিধা হইলেও, অধিকাংশ বালিকা জোর ১০।১১ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যাইতে পারে। তাহাদের পাঠ্য নির্ব্বাচনের সময় এ কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখা দরকার।

দেশের যেরূপ অবস্থা, অনেক বিষয়ের উচ্চতম শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার অনেক বিষয় এখানে হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে শিক্ষার্থী পাঠান বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতায় যে দেশীয়দের বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক শিক্ষাসমিতি হইয়াছে, তাহা একটী সুলক্ষণ বলিয়া মনে হয়। ঐ সমিতিকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া এবং যাহাতে উহার কার্য্যকারিতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়, সে বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আমাদের সকলের উচিত। কতকগুলি লোক বিদেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা ভাল করিয়া শিখিয়া আসিলে তাঁহারা দেশের অন্য লোককে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন; এবং কালে ঐ সব বিদ্যা আমাদের মধ্যে এত উৎকর্ষ লাভ করিবে যে, বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠাইবার আবশ্যক আর হইবে না। জাপানে এখন অনেকটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। দেশে ইতিমধ্যে আমরা যে দুই একটা কল কারখানা খুলিতে পারগ হইয়াছি, তাহাতে যতদূর সম্ভব শিক্ষানবিশ লওয়া দরকার। কল কারখানা শুধু জিনিষ তৈয়ারির উপায় নয়, লোককে হাতে কলমে শিক্ষা দিবারও এক প্রকৃষ্ট উপায়। শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তার ও উন্নতিসাধন করিতে হইলে দেশে কতকগুলি গবেষণাগার চাই। যে সব বিদ্যার উন্নতি গবেষণা সাপেক্ষ, তাহাদের সম্বন্ধে এখানে কিছু বলার আবশ্যক নাই। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, গবেষণালয় কতক স্থাপন না করিলে দেশের উন্নতি

হওয়া অসম্ভব। ইহাতে যে অনেক টাকা চাই তাহা বলা বাহুল্য। টাকার অভাবে স্বর্গীয় মহাপ্রাণ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞানসভা হইতে এ পর্য্যন্ত কোন বিশেষ কাজ হইল না।

একটা কথা এখানে বলা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে। মানুষ মানুষ, যন্ত্র নয়, ইহা যেন ভুলিয়া না যাওয়া হয়। অনেক উন্নতিশীল দেশে ব্যবহারিক ও কার্য্য-করী শিক্ষা এত দূর গড়াইয়াছে যে, মানুষ কলে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষা কার্য্যকরী করিতে গিয়া এবং প্রতিযোগিতা প্রবল হওয়ায় অনেক স্থানে লোকে ভুলিয়া গিয়াছে যে, সুলভ পণ্য দ্রব্য উৎপন্ন করাই মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঠিক্ উহা নয় বলিয়া মনে হয়। পণ্যদ্রব্য মানুষের জন্য, মানুষ পণ্য-দ্রব্যের জন্য নয়, এ শিক্ষার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের কোমল ও উচ্চবৃত্তি সমুদায়ের উচ্ছেদের সম্ভাবনা হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ সম্ভাবনার প্রতিকারার্থ দেখিতে হইবে যে, কোন শিক্ষাই যেন আত্মা-বিহীন না হয়। সকল শিক্ষার মূলে ধর্ম্ম-শিক্ষা ও নীতি শিক্ষা চাই। সকলেরই কোমল ও উচ্চ মনোবৃত্তির উন্মেষ হওয়া আবশ্যক। ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম-ভাব, সত্যপ্রিয়তা, স্বদেশহিতৈষিতা লোক-হিতৈষণা প্রভৃতি বৃত্তি সকলও স্ফুরিত হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে মানুষ হওয়া যায় না। ইহা ছাড়া সৌন্দর্য্যবোধ-বৃত্তিরও অল্প বিস্তর বিকাশ হওয়া চাই। সেই জন্য যে যে কাজ বা ব্যবসা করুক না কেন, কিছু কিছু সাহিত্য বা সুকুমার বিদ্যা ও কলা চর্চ্চা সকলেরই করা উচিত। নিজের গণ্ডীর বাহিরে যদি আমরা না যাইতে শিখি, তাহা হইলে জীবন নিরা-নন্দময় হইয়া উঠে, এবং জন্মগ্রহণ করা বৃথা বলিয়া মনে হয়। জীবনের সকল সময় কেহ কাজ করে না, বা করিতে পারে না। বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য যাহা আবশ্যক তাহা বাদ দিলেও খুব ব্যস্ত লোকেরও হাতে এমন সময় থাকে, যাহাতে কোন কাজ করা যাইতে পারে না, বা করার দরকার হয় না। যদি সাহিত্যাদির চর্চ্চা কিছু কিছু থাকে, তাহা হইলে জগ-তের কোথায় কি হইতেছে জানিতে একটু আগ্রহ, হয়, এবং সময় এমন করিয়া কাটান যাইতে পারে যাহাতে নিজের ও আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশি-বর্গের উন্নতি সাধন হয়, এবং জীবনের ভার অনেকটা কমিয়া যায়।

এখন একটা কথা উঠিতে পারে। আমি যে "দান সাগরি ফর্দ্দ" দিলাম, সকল দিক্ বিবেচনা করিলে উহা কি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে? দেশ শুদ্ধ নর-নারীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলা হই-য়াছে; উচ্চ শিক্ষা, মধ্য শিক্ষা, নিম্ন শিক্ষা, ব্যবহারিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চ্চা সকলে-রই ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে বলা হই-য়াছে। ইহাও ছেলেখেলা নয়। বন্দোবস্ত করিবেই বা কে এবং তাহার টাকাই বা

কোথায়? সব জানি। কিন্তু বাঁচিতে হইলে উহা যে আমাদিগকে করিতেই হইবে তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? কোন কাজ করিতে হইলে দুইটী জিনিষ দেখা আবশ্যক। প্রথম, উহা সুচারুরূপে করিতে হইলে কি কি দরকার, দ্বিতীয়, আমাদের পক্ষে উহার কতটুকু করা সম্ভবপর। সকল কাজেরই একটা আদর্শ থাকা চাই। তাহা হইলেই বুঝা যায় আমরা উহার কতটুকু করিতে পারিয়াছি, এবং কি পরিমাণে উহা বাকী আছে। আদর্শবিহীন কাজ কখনও সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না। উপরে লোকশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য হওয়া দরকার। এক দিনে ও একবারে যে, আমরা লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইব তাহা কেহ মনে করে না। কিন্তু যদি আমরা বাঁচিতে চাই, শিক্ষা সম্বন্ধে এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সুবৃহৎ কাজ দুই দশ দিনে হইবার নয়, এবং ইহা বহু অর্থব্যয় সাপেক্ষ। ইহার জন্য সরকার হইতে যত টাকা পাওয়া যায় তাহা আমাদিগকে লইতে হইবে, এবং তাহা ছাড়া দেশের লোককেও টাকা খরচ করিতে হইবে। দেশে যে সব ধনকুবের আছেন তাঁহাদিগকে অনেক অনাবশ্যক বিষয়ে খরচ কমাইয়া এই সর্ব্বহিতকর দেশরক্ষাকারী কার্য্যে মুক্তহস্তে অর্থ দান করিতে হইবে। সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যবহারিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দেশের কয়েকজন মহাত্মা অকাতরে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। ইঁহাদের ন্যায় লোক বেশী হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এবং সময়ে যে অনেকে ইঁহাদের পদানুসরণ করিবেন না, এ কথা কে বলিতে পারে? কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন,—এই লোকশিক্ষার ব্যবস্থা কেবল ধনীদের কাজ। যিনি যাহা দিতে সক্ষম, তাঁকে তাহা দিতে হইবে। কেহ বুদ্ধি দিবেন, কেহ সময় দিবেন, কেহ অর্থ দিবেন। আমি এক টাকা দিতে পারি, তাহাই আমার দেওয়া উচিত, আর এক জন হাজার টাকা দিতে পারেন, তিনি তাহাই দিন। যদি এক জন লোক অপর এক জনকে কিছু শিখাইতে পারেন, তাহা বড় কম কাজ হইবে না। যাঁর বুদ্ধি আছে, তিনি কার্য্যপ্রণালী উদ্ভাবন করুন, এবং কার্য্যকর্ত্তাদিগকে পরিচালন করুন। অনেকের সমবেত চেষ্টা যদি থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্রই আমরা তাহার সুধাময় ফল দেখিতে পাইব।

শিক্ষার ভাষা কি হইবে? যতদূর সম্ভব বাঙ্গালা। বর্ত্তমান অবস্থায় উচ্চশিক্ষা এবং নিদান কিয়ৎপরিমাণে মধ্যশিক্ষা ইংরাজী ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় হইতে পারে না। বাঙ্গালা সাহিত্যের যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বতোমুখী উন্নতি না হইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত গত্যন্তর নাই। কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি চাই। সাহিত্যের উন্নতি জাতীয় উন্নতির পরি-

চায়ক এবং উন্নত সাহিত্য জাতীয় উন্নতির পুষ্টপোষক। বিদেশীয় ভাষা কখন জাতীয় শিক্ষার ভাষা হইতে পারে না।

লোকশিক্ষার ব্যবস্থা যদি ভালরূপ হয় তাহা হইলে আমরা আর যাহা চাই তাহা আপনা আপনি আসিয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের আবশ্যক নাই, আনুসঙ্গিক দুই এক কথা বলিলেই চলিবে।

(২) শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। শরীর ভাল না হইলে আমাদের দ্বারা কোন কাজ হইবে না। শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য আগে চাই। মানুষ শুধু আত্মাময় নয়, সে শরীর ও আত্মার জড়িত জীব। তুমি যতই বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হও না কেন, রোগে তুমি যদি নির্বীর্য্য হইয়া পড়, শক্তির অভাবে যদি তুমি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়, দেশের কথা দূরে থাকুক, নিজেরই কোন কাজে তুমি লাগিবে না। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারি কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থার আবশ্যক। প্রত্যেক গ্রামের জল নিকাশের উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। এ সবের জন্য যদি কেবল জেলা বোর্ড বা কর্ত্তৃপক্ষদের মুখের দিকে তাকাইয়া আমরা বসিয়া থাকি, তাহা হইলে কলির কয় দিন আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। গ্রামের শিক্ষিত ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে কথায় ও কার্য্য দ্বারা অপর সাধারণকে গ্রামের উন্নতির কাজে লাগাইতে হইবে। কিসে গ্রামের বালক বালিকাদের শরীর রোগশূন্য হইতে পারে তাহা লোককে বুঝাইতে হইবে। যাহাতে গ্রামের ছেলেরা ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের জলবায়ু শারীরিক পরিশ্রমের প্রতিকূল। এই নৈসর্গিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমাদিগকে চলিতে হইবে এ কথা যেন মনে থাকে। এখানে কেবল পল্লীগ্রামের উল্লেখ করিলাম, কারণ দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামবাসী, এবং আমাদের পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সহর অঞ্চলের অবস্থার আভাষ পূর্ব্বে কিছু দিয়াছি। এখন এইমাত্র বলিলেই চলিবে যে, স্বাস্থ্যকর নগর দেশে বড়ই কম, এবং প্রায় সকল নগরেই গড় পড়তা মৃত্যুর হার খুব বেশী। ইহাদের বিশেষ উন্নতি আবশ্যক।

(৩) দেশে কৃষির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহার উন্নতি সাধন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কৃষিবিদ্যালয়ের কথা উপরে বলিয়াছি। যাহাতে পূর্ব্ব প্রচলিত ফসল সকলের উন্নতি হইতে পারে, এবং অর্থকরী নূতন ফসল কতকগুলি প্রচলিত হইতে পারে, তাহার বিধিমতে চেষ্টা করা চাই। সকল বড় জমিদারের বা তালুকদারের তাঁদের প্রজার উন্নতিকল্পে এবং দেশের ভাবী মঙ্গলার্থে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র রাখা উচিত হইয়াছে। ইহা সংখ্যায় নিতান্ত কম হইলে চলিবে না। ঐ সব ক্ষেত্র হইতে তাঁদের প্রজারা যতদূর

সম্ভব শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুর অবস্থা কিরূপ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহাদের উন্নতির দিকে যদি আমরা মন না দিই তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে ইহারা লোপ পাইবে। কিসে প্রচুর পরিমাণে ইহাদের খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে, কিসে ইহাদের বংশের উন্নতি সাধিত হইয়া ইহারা প্রচুর পরিমাণে ভাল দুধ প্রদান করিতে পারে, এবং ভাল করিয়া হলকর্ষণাদি কার্য্য করিতে পারে, কিসে ইহাদের মধ্যে মড়ক নিবারিত হইতে পারে, এ সব কাজের ভার আমাদের উপর। আমরা না করিলে আর কেহ করিবার নাই।

(ক্রমশঃ)

বেহুলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

নদীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কলার মান্দাস বামে দক্ষিণে নানা গ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। গ্রামবাসীগণ বেহুলার রূপ লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল, অনেকেই তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কেহ কেহ তাঁহার পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিল, কেহ বা তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তিরস্কার করিল। মনুষ্যমাত্রেই সংসারের সকল লোককে আপনার মত জ্ঞান করে—সরলপ্রকৃতি সাধু তজ্জন্যই দুষ্টের দুরভিসন্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন না, দুষ্ট দুরাত্মারাও সাধুর সরলতা জনিত সুখাস্বাদে বঞ্চিত। গাঙ্গুর নদীর তীরবর্ত্তী গ্রামবাসীগণ, যাহার যেমন মন সে তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে নানা কথা বলিতে লাগিল—বেহুলা প্রায় কাহার কোন কথার উত্তর দিলেন দিলেন না, তবে ব্যক্তি বিশেষকে তিনি একবারে উপেক্ষাও করিলেন না। পথিমধ্যে বেহুলার অনেক বিপদও ঘটিয়াছিল, নদীজল মধ্য হইতে বোয়ালী প্রভৃতি শবভুক মৎস্যাদি জলজন্তুগণ তাহার স্বামীর শব আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত হইল না—সে সকল আপদ অত্যাপাতে যদি পরিত্রাণ ঘটিল, পথিক ও গ্রামবাসীগণের ভয় উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কেহ লোভ প্রদর্শনে তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করিল, কেহ বা তাহার অন্য অত্যাচারের ভয় দেখাইল, কেহ বা চিকিৎসকের ভাণ করিয়া তাঁহার স্বামীর জীবন দানের লোভ দেখাইল, কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিল না। পতিপরায়ণা সতীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কিছুতেই দুর্ব্বল হইল না—তিনি, বলে না হউক, কলে কৌশলে অনুনয় বিনয়ে, পাত্র বিশেষে ভয় প্রদর্শনে সর্ব্বত্র অব্যাহত থাকিয়া আপনার পথে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন যায়—লখিন্দরের শব ক্রমেই পচিতে

লাগিল—পূতিগন্ধে চতুর্দ্দিকের বায়ু দূষিত হইল, বেহুলার মনে বিকার নাই—তিনি সেই শবরক্ষার নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহার অনেক তথ্যই তাঁহার সংগ্রহ করা ছিল।

এইরূপে গাঙ্গুর নদীর জলে ভাসিতে ভাসিতে বেহুলা গঙ্গার সহিত গাঙ্গুর নদীর সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি ভাগীরথীর পবিত্র বারিধারায় অবগাহন করিলেন, স্বামীর শবও উত্তমরূপে গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া লইলেন, তাহার পর বিস্তৃতাঙ্গী সুরধুনীর জলে ভাসিয়া চলিলেন, গঙ্গার তরঙ্গে মান্দাস প্রতিক্ষণেই টল্ মল্ করিতে লাগিল, বেহুলা তাহাতে ভীত হইলেন না, ইষ্ট দেবতার উপর আত্ম-নির্ভর করিয়া চলিলেন, ক্রমে তিনি মুক্ত-বেণী ত্রিবেণীতে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। তখন রাত্রি শেষ হইল, পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইল। তাহাতে উষার আসন পড়িল। গাছে পাখী ডাকিল। সেখানে আসিয়া একটু অন্তরালে থাকিয়া বেহুলা দেখিলেন, একটা রজকী মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য উপস্থিত হইল, সে বস্ত্রের বোঝা নামাইয়া, কোলে একটী শিশু ছিল তাহাকে স্তন্য দানের পর মারিয়া ফেলিল—শিশু অচেতন স্পন্দহীন অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া রহিল, রজকী বস্ত্র ক্ষালনে প্রবৃত্ত হইল; বেহুলার যাওয়া হইল না, ভেলা বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সমস্ত দিনের পর রজকী সায়ংকালে বস্ত্র-গুলিকে গুছাইয়া মোট বাঁধিল, মোট মস্তকে করিয়া শিশুটীকে পুনর্জ্জীবিত করিল, জীবিত শিশুকে কোলে লইয়া স্তনাদান করিতে করিতে সে আপনার পথে অগ্রসর হইল। বেহুলা রজকীর আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া তাহাকেই আপনার ইষ্টসিদ্ধির অনুকূল বিবেচনা করিলেন, সে রাত্রি আর অগ্রসর হইলেন না। তথায় অবস্থিতি করিলেন। রাত্রি অবসান হইল, পূর্ব্বদিনের ন্যায় সেদিনও প্রভাতে রজকী শিশুপুত্রকে স্তন্য দান করিতে করিতে জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ আপন শিশুকে চৈতন্যশূন্য করিল, এবং আপনার কাজে নিবিষ্ট হইল। সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যা হইল, রজকী মোট বাঁধিল, ছেলেকে কোলে লইল, আপনার পথে অগ্রসর হইবে এমন সময় বেহুলা নিকটস্থ হইয়া তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইল, রজকী অতি ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে উঠাইল, এবং তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসু হইল। বেহুলা কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা তাহাকে জানাইলেন। রজকীকে মাতৃঃস্বসা (মাসী) সম্বোধন করিলেন, রজকী তাঁহাকে পরদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন, বেহুলা তাহাই করিলেন। তাহার নাম নেত রজকী, সে স্বর্গবাসী সুরগণের বস্ত্র ক্ষালন করিত। পর-দিন প্রাতে সে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে বেহুলা নিজে বস্ত্র ক্ষালন করিবার কথা বলিলেন, রজকী বলিল—"বস্ত্রগুলি দেবতা-দের, তাঁহারা স্বভাবতঃ কোপনস্বভাব,

কাপড় কাচা ভাল না হইলে অভিশাপের ভয় আছে, তুমি পারিবে না।" বেহুলা নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়া একখানিও কাপড় কাচিতে পান এরূপ প্রার্থনা জানাইলেন। বেহুলার ঐকান্তিকতা দর্শনে রজকী সম্মত হইল, বেহুলা প্রাণপণ যত্নে কাপড়খানিকে কাচিল—নেত যে সকল কাপড় কাচিয়াছিল বেহুলার কাচা কাপড় তাহা অপেক্ষা পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইল, সন্ধ্যাকালে নেত কাপড়গুলিকে গুছাইয়া লইয়া দেবলোকে গেল, বেহুলাও সঙ্গে চলিলেন, সেখানে গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন, নেত ধোপানী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি সমন্বিত দেবসভায় উপস্থিত হইয়া বস্ত্রগুলি অর্পণ করিল। বেহুলা যে কাপড় কাচিয়াছিলেন, সেখানি মহাদেবের—তিনি দিগম্বর বলিয়াই প্রসিদ্ধ, সাধ করিয়া কখন কোনদিন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন, বস্ত্র দেখিয়া তিনি বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন, নেতকে বলিলেন, "নেত! আজি যে কাপড়ের বড়ই বাহার বাড়িয়াছে, একদিনও তো এমন কাপড় কাচা দেখি না।"

নেত উত্তর করিল, আমার এক ভগ্নীর কন্যা আমার বাড়ীতে আসিয়াছে, সেই আপনার কাপড়খানি কাচিয়াছে।

দেবাদিদেব বলিলেন,—তাহাকে তো কখন দেখি নাই—দেখাইতে পার?

এই কথা শুনিয়া নেত ধোপানী তাঁহার নিকট বিদায় লইল এবং বেহুলার নিকটে আসিয়া সকল কথা বলিল। বেহুলা তাহার সদ্ব্যবহারে দেবসভায় গমন করিলেন। তিনি যে তৌর্য্যত্রিকী বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন, নেত সে পরিচয় পাইয়াছিল। স্বর্গবাসী দেবগণ বড়ই বিলাসী—স্বর্গসুখের কথা বলাই বাহুল্য, স্বর্গসুখের তুল্য সুখ আর কোথাও নাই, কিছুই নাই, সেই স্বর্গবাসীরা যে বিলাসী হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? নেত দেবসভায় বেহুলার নৃত্যগীতজ্ঞতার পরিচয় দিলে সকলেই একবাক্যে তাঁহার নৃত্য দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, বেহুলাও সসম্ভ্রমে তাঁহাদের চরণতলে প্রণত হইয়া আপনার ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলেন। অনুমতি পাইয়া তিনি নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন, দেবসভাস্থ সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। দেবদেব মহাদেব বেহুলার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে বেহুলা, সজলনয়নে আপনার পরিচয় দিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার সুগোচর করিলেন এবং মৃত স্বামীর জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। মনসাদেবী সভায় উপস্থিত ছিলেন না—দেবসভার আজ্ঞা পাইয়া নেত ধোপানী তাঁহাকে ডাকিতে গেল; মনসা দেবী ঘরে বসিয়া সমস্তই জানিতে পারিয়াছিলেন, সর্ব্ব প্রথম আসিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু নেতর নির্ব্বন্ধে তাহার সমভিব্যাহারিণী হইলেন। কিয়ৎকাল মধ্যেই তাঁহারা দেবসভায় উপস্থিত হইলে ভুজঙ্গজননী মনসাকে দেখিয়া সকলেই সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসিতে আসন দিলেন।

বেহুলা কৃতাঞ্জলিপুটে দেবগণ সমীপে পুনরায় মনসার ক্রোধে স্বামীর প্রাণনাশের সকল কথা বিবৃত করিলে, দেবী বলিলেন—"বেহুলার শ্বশুর গ্রামে গ্রামে আমার পূজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহার জন্য আমি তাহার সকল পুত্র নষ্ট করিয়াছি ও সাত খানি ডিঙ্গা নৌকা ডুবাইয়াছি, তথাপি তাহার জ্ঞান হয় নাই, আমার অসম্মান করে।"

বেহুলা শ্বশুরের ত্রুটী মানিয়া লইলেন, আর বলিলেন, ভবিষ্যতে আর তাঁহার অসম্মান হইবে না, শ্বশুর ভক্তিসহকারে আপনার পূজার্চ্চনা করিবেন।"

মনসা ঠাকুরাণী দেবগণ কর্তৃক বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বেহুলাকে তাঁহার স্বামীর কঙ্কালগুলি আনিতে বলিলেন, বেহুলা দৈবশক্তি প্রভাবে ত্রিবেণীর ঘাট হইতে লখিন্দরের কঙ্কালগুলি লইয়া সুরলোকে পঁহুছিলে মনসা দেবী সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাহার অভিনব কলেবরের পুনর্গঠন করিয়া তাহাতে জীবন সঞ্চার করিলেন। সমাগত দেবগণ মনসাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। মৃতপতিকে জীবিত পাইয়া বেহুলা স্বামীর অগ্রজ ছয় জনের এবং শ্বশুরের সপ্তডিঙ্গার পুনরুদ্ধারের প্রার্থনা জানাইলে দেবী তাহাতে কৃপণতা করিলেন না। বেহুলার চেষ্টা যত্নে চাঁদ সদাগরের সাত পুত্র পুনর্জীবন লাভ করিল, সাত ডিঙ্গার পুনরুদ্ধার হইল। বেহুলা সেই গাঙ্গুর নদীর বক্ষে সপ্তডিঙ্গা, ছয় ভাসুর ও স্বামীকে লইয়া চাম্পাই নগরে উপস্থিত হইয়া শ্বশুর শ্বশ্রূর চরণ যুগলে প্রণত হইলেন। সকলেই বেহুলাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল—অতঃপর চাঁদ মনসার মাহাত্ম্য মানিয়া লইলেন, নানা উপচারে মহা আড়ম্বরে তাঁহার পূজা করিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন সাত পুত্র, সাত বধূ ও বহু পৌত্র পৌত্রীকে লইয়া কিছুকাল সংসারসুখ ভোগের পর ইহলোক লীলা সম্বরণ করিলেন।

শ্রীঅম্বিকা চরণ গুপ্ত।

বীরনারী জিন মেরী গায়েন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

পরীক্ষারাশির বিষম আঘাতে যখন মেরী গায়েনের প্রতিভাপূর্ণ কর্ত্তব্যশাসিত জীবন ভগবানের আশীর্ব্বাদের বলে বলীয়ান্ হইয়া কঠোর সংসারপথে চলিতেছিল, তখন তিনি বল ও শান্তি লাভ করিবার ব্যাকুলতায় হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া, শয্যাশায়িনী হইলেন। "হয়ত এযাত্রা আপনার রক্ষা নাই," চিকিৎসক যখন অনেক সন্তর্পণের সহিত এ কথা তাঁহাকে জানাইলেন, তখন মেডেম

গায়েনের আনন্দের সীমা রহিল না। তরুণবয়স্কা মেরীর জীবন এত অসহ্য ক্লেশপূর্ণ ছিল যে, তিনি মৃত্যুকে প্রসন্নমুখে আলিঙ্গন করিতেও ভীত হইলেন না। ঠিক্ এই সময়ে কাউণ্ট গায়েনের অনেক সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। এই সংবাদেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। পার্থিব দুঃখরাশির নিকট তিনি শির অবনত করিয়াছিলেন। সংসারের কোন কষ্টই তাঁহাকে বর্ত্তমান অবস্থাপেক্ষা ক্লেশ দিতে সমর্থ নহে, ইহা তিনি দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যদ্বারা সকলকে উত্তমরূপে বুঝিতে দিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অপরিসীম রোগযাতনা ভোগের পর তিনি পুনরায় স্বাস্থ্যের মুখ দর্শন করিলেন। এখন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে ধর্ম্ম-সাধন আরম্ভ করাতে, তাঁহার স্বামীর কোপানল শতগুণে প্রজ্বলিত হইয়া নিশিদিন এই সাধ্বীর সুকোমল জীবন দগ্ধ করিতে লাগিল। "তোমার দেখি ঈশ্বরভক্তি স্বামিভক্তি অপেক্ষা অধিক," এই বলিয়া বাতরোগাক্রান্ত, শয্যাশায়ী, বৃদ্ধ ও অপদার্থ স্বামী, পত্নীর নির্য্যাতনে সচেষ্ট হইল। মেডেম গায়েনের উপাসনার বিঘ্ন সম্পাদন জন্য মাতা ও পুত্রে অনেক কুমন্ত্রণা চলিতে লাগিল। স্বামীর রোগ-শয্যা সম্মুখে, কিম্বা ঐ পিশাচী শ্বশ্রূর প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকা ভিন্ন তাঁহার কোথাও যাওয়া নিষিদ্ধ হইল। দুঃখিনী মেরী অনন্যোপায় হইয়া যখন সেলাই দ্বারা সময় কাটাইবার প্রয়াস পাইতেন, তখনও তিনি উপাসনার্থে মুখ নাড়েন কিনা লক্ষ্য করিবার জন্য পাহারাদল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিত।

মেরীর অন্ধকারপূর্ণ জীবনের আরম্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পাছে পিতার সংসর্গগুণে সেও ঐরূপ পিশাচ-প্রকৃতি লাভ করে, এই আশঙ্কায় কত যত্ন ও অসীম ধৈর্য্যবলে পুত্রটীর শিক্ষা ও সুমতি দানের জন্য প্রাণপাত করিতেন, তাহা অবর্ণনীয়। মেরী দিনের সমস্ত আশা ভরসাস্থল ও কুজ্ঝটিকাপূর্ণ জীবনের আলো ঐ সন্তানকে পর্য্যন্তও জননীর প্রতি অবজ্ঞা ও অপমান করিতে শিক্ষা আরম্ভ হইল। এই ভীষণ পরীক্ষাসাগরে একমাত্র প্রার্থনাই তাঁহার সম্বল ছিল। তিনি ঐ সময়ে দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছিলেন, "পৃথিবীর কাহারও সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, মনেও হয় না। সুতরাং তাহাদের অনাদর, অবজ্ঞা ও তাড়না, কিছুতেই হৃদয়ের প্রগাঢ় শান্তি বিনষ্ট হয় না। সংসারের পক্ষে আমি মৃতা। ঈশ্বর আমাতে বাস করেন; তিনিই জীবনের জীবন ও ঘোর তিমির-সাগরে ধ্রুবতারা। তাঁহার বলেই আমার পরীক্ষাহত ক্ষীণ প্রাণ শক্তিশালী"। পাঠক! মেরী গায়েনের হৃদয় শুদ্ধ প্রার্থনার বলে কি অতুল শান্তিপূর্ণ ও সবল হইয়া কঠোর কর্ত্তব্যপথে অনাহত-ভাবে দণ্ডায়মান ছিল, তাহা বিশেষভাবে স্মরণ করুন। এই মহীয়সী মহিলার জীবনীপাঠে কে বলিতে সাহসী হইবে যে, ঈশ্বরদর্শন কল্পনার কথা! মেরী গায়েন

যে সকল মনোহর কবিতাস্তবক গ্রন্থন করিয়া গিয়াছেন, সাহিত্যজগতে তাহার অমিয়া সৌরভে চিরকাল নর নারীর হৃদয়কে উন্মত্ত ও বিমুগ্ধ করিবে। সময়ান্তরে ঐ সকল কবিতার ভাবাংশ লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা রহিল।

ক্রমশঃ।

গোধন রক্ষা।

ভারতে নিত্য বহুসংখ্যক গোধন ধ্বংস হওয়াতে, সমগ্র ভারতবাসীর যেরূপ অনিষ্ট হইতেছে, অবশিষ্ট ধ্বংসোন্মুখ গোধনকুলকে অচিরে রক্ষা না করিলে, এবং গোজাতির বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন না করিলে যে, কিছুদিন পরে ভারতবাসীর পক্ষে অধিকতর মহা অনিষ্ট হইবে, ইহা নিশ্চিত। পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ এদেশে আগমন করিয়া, যেমন আমাদিগের শিল্প, পণ্য, ব্যবসা, বাণিজ্য, নষ্ট করিয়া সমুদয় ভারতবাসীকে নিতান্ত হীনভাবাপন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, তেমনি প্রতিদিন এই গোধনগুলিকে ভক্ষণ করতঃ ভারতবাসীর অনায়াসলব্ধ গোদুগ্ধ পানে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছেন এবং ইহাদের উন্নতির সর্ব্ববিধ যত্নের অভাবে ইহারা দিন দিন রোগগ্রস্ত ও বলহীন হইয়া পড়িতেছেন। আজ ভারতবাসীর সে প্রতিভা বীর্য্য নাই, সে তেজ দর্প নাই, সে সাহস বিক্রম নাই, সে উদ্যম দৃঢ়তা নাই,—বলকারক খাদ্যাভাবে ভারতবাসী আজ নিস্তেজ ও হীনবল। গোদুগ্ধই ভারতের জল বায়ুর উপযোগী, উৎকৃষ্ট বলকারক খাদ্য। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; এ দেশে নিত্য মাংসাহার করা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য ও অনিষ্টকর। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, মাংস অপেক্ষা দুগ্ধ আটগুণ অধিক বলকারক। পরন্তু দুগ্ধ সাত্ত্বিক আহার, মাংস রাজসিক আহার। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, সাত্ত্বিক আহার সমগ্র মানবজাতির পক্ষে অতীব মঙ্গলকর। আমাদের আর্য্যশাস্ত্রকার মনু ও সর্ব্ববিধ মাংসাহার যে আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ তাহা নিম্ন শ্লোকেই দেখাইয়াছেন;—

মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহং।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
(মনু ৫ অ, ৫৫ শ্লোক।)

পাশ্চাত্য দেশবাসিগণই যে কেবলমাত্র গোকুলকে ধ্বংস করিতেছেন তাহা নহে, যে অবধি মুসলমানগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই সময় হইতে গোবংশ ধ্বংস হইতে আরব্ধ হইয়াছে। তবে পাশ্চাত্য দেশবাসীরা যেরূপ বহুসংখ্যক গোধন নিধন করিতেছেন, তাহার তুলনায় মুসলমানগণ শতাংশের একাংশও করেন নাই। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে অনেকে আদৌ গোমাংস ভক্ষণ করেন না।

যাঁহারা বা গোমাংস আহার করেন, তাঁহারা অনেকেই প্রত্যহ খান না। পর্ব্ব উৎসব ব্যতীত দৈনিক শাক শবজী, ডাল, অন্ন, দুগ্ধ, মৎস্য খাইতেই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্য গোমাংস-ভক্ষক মুসলমানের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু য়ুরোপীয়দিগের অভ্যাসবশতঃ তাঁহাদের গোমাংস ভক্ষণ ব্যতিরেকে দিন অতিবাহিত হয় না। আবার আমাদিগের দেশেরও কতকগুলি পাশ্চাত্য শিক্ষানবিশী অবিমৃষ্যকারী হিন্দু পুরুষ ও মহিলা পাশ্চাত্য অনুকরণ করতঃ গোরক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, গোমাংস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত ঘৃণা ও দুঃখের বিষয়। এই গোমাংসভক্ষক সাম্প্রদায়িকেরা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন, অতি প্রাচীনকালের মুনি ঋষিগণও গোমাংস ভক্ষণ করিতেন। পুরাকালের কয়েকজন মুনি ঋষি যে গোমাংস আহার করিয়াছিলেন ইহা অলীক বাক্য নহে বটে (১) কিন্তু তাঁহারাই যখন বুঝিতে পারিলেন যে, গোমাংস ভক্ষণ অপেক্ষা গোজাতির রক্ষণই দেশের ও দেশবাসীর পক্ষে মহাহিতকর, তখন হইতেই তাঁহারা গোমাংস ভক্ষণ যে মহাপাপ, তাহাই বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় হইতে হিন্দুর পক্ষে গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত। এমন কি তাঁহারা গোমাংসাহারী ব্যক্তির সহিত হিন্দুর একত্র পান ভোজনেও যে মহাদোষ, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, অধুনা নব্য সভ্য সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ পুরাকালের মুনি ঋষিদিগের দেশহিতকর নিষেধবাক্য অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, গোমাংস ভক্ষণ করিলেই কি যত পাপ হয়? মৎস্য, মেষ, ছাগ প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করায় কি পাপ হয় না? জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেন, সর্ব্বজীবহত্যাই মহাপাপ! গো হননেও যে পাপ হয়, ক্ষুদ্র শফরীর বধেও সেই পাপ। তবে যে মৎস্যভোজী, সে শুধু প্রাণিহত্যাজনিত পাপই অর্জ্জন করে, গোখাদক প্রাণিহত্যাজনিত পাপও অর্জ্জন করে এবং গোধনকুলকে নিধন করিয়া সর্ব্ব-

(১) প্রাচীন আর্য্যগণ যৎকালে হিমালয় পার হইয়া ভারতে আসিয়া বাস করেন, তৎকালে অসহ্য শীতপ্রধান ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতিতে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। শীত প্রধান স্থানে বাস করায় তাঁহারা অনেকে গো মাংস ভোজন করিতেন। ক্রমশঃ যখন উষ্ণ প্রধান দাক্ষিণাত্যে তাঁহারা বিকীর্ণ হইয়া পড়িলেন তখন শাস্ত্রে গোমাংস ভোজন একেবারেই নিষিদ্ধ হইল। প্রায়ই দেখা যায় এদেশের গোমাংসভোজীরা কুষ্ঠাদি বীভৎস রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে গাভীকে লোকমাতা বলিয়া থাকে। মাতৃদুগ্ধ শৈশবে কিছুদিন মাত্র সেব্য, কিন্তু গোদুগ্ধ সর্ব্বাবস্থায় মুমূর্ষু কাল পর্য্যন্ত সেবনীয়। যাহার মলমূত্র পর্য্যন্ত অশেষ মঙ্গলের আধার, তাহার ন্যায় মহোপকারী—অবশ্য রক্ষণীয় জীব এ জগতে আর কি আছে জানি না।

সাধারণকে গোদুগ্ধ পানে বঞ্চিত করার মহাপাপও অর্জ্জন করে। এই সভা সাম্প্রদায়িকেরা গো-বধ হেতু যে পাপ হয় সেই মহদ্বাক্য কুসংস্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। ইহাদিগের সমীপে গোধন রক্ষার কথা উত্থাপিত করিলে ইহারা গোঁড়ামি বলিয়া পরিহাস পূর্ব্বক সে কথা উড়াইয়া দেন।

এইরূপে তিন সম্প্রদায়ের গো-ভক্ষণে এদেশের গোজাতির সংখ্যা দিন দিন ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। দিনে দিনে গো-ভক্ষকের সংখ্যা এরূপ ভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইলে, ভারত হইতে যে গোজাতির অস্তিত্ব লোপ পাইবে ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাণিজ্যনিপুণ পাশ্চাত্য দেশবাসিগণেরও বোধ হয় ইহাই অভিপ্রেত যে, ভারতের গোবংশ সমূলে নির্ম্মূল হইলে বিলাতি জমাট দুগ্ধ এদেশে সরবরাহ করিয়া তাঁহারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশে লইয়া যান। হায়! আজ ভারতবাসিগণ গোধনকুলের রক্ষার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন! গোধনকুল বিনাশ হেতু ভারতের যে কি গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা কেহই দেখিয়াও দেখিতেছেন না, বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। আজ ভারতবাসিগণ জাতীয় জীবনের উন্নতির নিমিত্ত সচেষ্ট। জাতীয় জীবনের উন্নতি করিতে হইলে জাতির শারীরিক ও মানসিক বিপুল শক্তির প্রয়োজন। শক্তি সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে জাতির পুষ্টিকর আহারের আবশ্যক। দুর্ব্বলের দ্বারা জাতীয় জীবনের উন্নতি কুত্রাপি সংসাধিত হয় না। দুর্ব্বল ব্যক্তি ঘোর তমোভাবাপন্ন, ভয়-মোহ, নিদ্রা, আলস্য, লজ্জাবন্ধন প্রভৃতি অসৎ গুণের দ্বারা সর্ব্বদা আচ্ছন্ন। বলিষ্ঠ ব্যক্তি রজোগুণসম্পন্ন—তাঁহারা নিরলস, উদ্যোগী, সাহসী, কর্ম্মশীল ও বীর্য্যবান্। জ্ঞান হইলে, মনুষ্য রজোগুণ হইতে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়। আজ বলকারক সাত্ত্বিক আহার অভাবে ভারতবাসী দুর্ব্বল হইয়া ঘোর তমোভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

বিলাসিতার মোহে আক্রান্ত হইয়া ভারতবাসী আজ বৈদ্যুতিক আলো, বৈদ্যুতিক পাখা, মটরকার, বিলাতি, কুকুর, বিলাতি পাখী ইত্যাদি ক্রয় করত যে টাকা অপব্যয় করিতেছেন, সেই টাকায় যদি গোধন রক্ষা করেন, তাহা হইলে দেশের ও সমাজের মহান্ উপকার করা এবং স্বকীয় পুণ্য সঞ্চয় হয়। আজ যদি আমাদের পূর্ব্ব পিতৃপিতামহের সঞ্চিত গোধনগুলি বংশপরম্পরানুক্রমে সযত্নে রক্ষিত হইত, তাহা হইলে কি বৎসরে বৎসরে অজন্মা দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি নরনারী অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইত? শস্যাভাবে সকলে গো-দুগ্ধ পানেই জীবন ধারণ করিতে পারিত। চিকিৎসকেরা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দেখিয়াছেন যে,—মনুষ্যের শরীররক্ষার উপযোগী সমুদায় পদার্থই গো-দুগ্ধে বিদ্যমান আছে। পুরাকালে দুগ্ধ ঘৃত এত সুলভ ছিল যে তখনকার লোকেরা

প্রচুর পরিমাণে ঘৃত দুগ্ধ ভক্ষণ করিয়া উদ্বৃত্ত ঘৃতে নিত্য হোমাদি করিতেন। সেকালের অধিকাংশ লোকই সাত্বিক ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে লোকে একটু ঘৃত দুগ্ধ খাইতে পান না, হোমাদি করিবেন কি প্রকারে? সুতরাং পুরাকালের সেই পুণ্যপ্রদ বৈদিক হোমাদি ক্রিয়া এখন একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আজকাল গোধনের সংখ্যা হ্রাস হওয়া বশতঃ খাঁটি গো-দুগ্ধের মহা অভাব হইয়াছে। যদিও পশ্চিমাঞ্চলে কিয়ৎ পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বের তুলনায় বিস্তর কম। আইন আকবরীতে দেখা যায়,—পূর্ব্বে খাঁটি গো-দুগ্ধ টাকায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সের পাওয়া যাইত, বর্ত্তমান সময়ে অতি কষ্টে সহরে টাকায় চারি সের সাড়ে চারি সের দুগ্ধ মিলে। পশ্চিমাঞ্চলে টাকায় বার তের সেরের অধিক পাওয়া দুষ্কর। পূর্ব্বে গো-দুগ্ধের সচ্ছলতা প্রযুক্ত ক্ষীর, সর, দধি, ননী, ছানা প্রভৃতি পুষ্টিকর ও তৃপ্তিকর উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য সমূহ সুলভে পাওয়া যাইত। আকবরের সময়ে গব্য ঘৃত যেখানে টাকায় পাঁচসের ছিল, আজকাল গো-সংখ্যার অল্পতা হেতু গব্য ঘৃত সেখানে টাকায় চৌদ্দ ছটাক হইয়াছে। পূর্ব্বে ঘৃতের প্রচুরতা নিবন্ধন ঘৃত-পক্ক উপাদেয় মিঠাইয়ের খাদ্য সামগ্রীও অতি সুলভ ছিল; অধুনা দুগ্ধের অভাবে দুগ্ধোৎপন্ন এবং ঘৃতপক্ক আহার্য্য বস্তু সমস্তই অতিশয় মহার্ঘ্য হইয়াছে। উৎসব ও পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে সহরে সন্দেশ আশি নব্বুই টাকা মণ হয়, ক্ষীর পঞ্চাশ পঞ্চান্ন টাকা মণ হইতেও দেখা যায়; এবম্প্রকার যাবতীয় দুগ্ধোৎপন্ন বা ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি অধিকতর মহার্ঘ্য হইয়া থাকে। এবং দিনে দিনে মহার্ঘ্যতার মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত দরিদ্র ভারতবাসী—যাহারা একাহ্নে উদর পূরিয়া আহার করিতে পায় না, তাহারা এই সকল দ্রব্য অধিক মূল্য দিয়া কি প্রকারে খরিদ করিতে পারে? এদেশের দুগ্ধ ও অন্নই প্রধান খাদ্য, কিন্তু অন্ন তো বহুদিনই বিদেশের অধিকৃত হইয়াছে, গো-দুগ্ধও নিঃশেষ প্রায়। দেশের তণ্ডুল দেশে রাখিবার আপাততঃ কোন উপায় নাই, যে হেতু বিদেশী বণিক্‌গণ দ্বিগুণ অর্থ দিয়াও এ দেশ হইতে ধান্য স্বদেশে লইয়া যাইবেন। সে স্থলে দরিদ্র দুর্ব্বল ভারতবাসীর প্রতিযোগিতা করা সহজসাধ্য নহে। দুগ্ধ রাখিবার এখনও কিঞ্চিৎ উপায় আছে; ভারতের সমগ্র ইতর ও ভদ্রমণ্ডলী কেবলমাত্র গোপদিগের প্রতি গোধন রক্ষার ভার অর্পণ না করিয়া, যদি সকলেই অবস্থা অনুসারে গো পোষণ করেন এবং প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি গাছ প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের ন্যায় "শ্রীকৃষ্ণ গোশালা" সদৃশ এক একটী স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাইয়া বা গোচারণভূমি ক্রয় করিয়া দেন, তবে গো-রক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়। যাঁহারা গোশালা

প্রতিষ্ঠার ব্যয়ভার বহন করিতে ও গো পোষণ করিতে অক্ষম, তাঁহারা ক্ষমতা অনুযায়ী চাঁদা দান করিয়া যদি ভারতের প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক পল্লীতে শ্রীকৃষ্ণ-গোশালার ন্যায় সম্মিলিত সাহায্যে এক একটী গোশালা স্থাপন করেন এবং তাহাদিগের বল, স্বাস্থ্যরক্ষা ও ক্রমোন্নতির বর্ত্তমান সময়োপযোগী উপায় নির্দ্ধারণ ও তাহার অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে অনেক গোধনের জীবন রক্ষা হয় ও সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ঐ সকল স্থান হইতে উত্তম গো দুগ্ধ খরিদ করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। ঐ সকল গাভীর গর্ভোৎপন্ন বৃষগুলিকে বিনামূল্যে কৃষকনিচয়কে প্রদান করিলে তাহাদের পক্ষে বহুল উপকার হইতে পারে। কেননা এক জোড়া বলদ এখন আশি পঁচাশি টাকার কমে পাওয়া দুঃসাধ্য। এত অধিক মূল্যে দরিদ্র কৃষকগণ বলদ ক্রয় করিয়া দারুণ ঋণভারাক্রান্ত হইয়া অবশেষে কৃষিকর্ম্ম ত্যাগ করতঃ অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। কিন্তু যদি সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে তাহারা বিনামূল্যে বলদগুলি পায়, তাহা হইলে পুনরায় কৃষি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তাহারা অধিক শস্য উৎপন্ন করাইতে পারে এবং স্বচ্ছন্দে তাহাদের পারিবারিক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এখন গোধন রক্ষার বিষয়ে কেহই মনোযোগী নহেন। গোপগণ এ সম্বন্ধে যাহা করিতেছেন, তাহাই যথেষ্ট জ্ঞানে সকলেই নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। কিন্তু আমাদের স্বার্থপরায়ণ অর্থপিশাচ এই গোপগণ আজকাল গো-রক্ষণে যত্নবান্ না হইয়া গোহননেরই সহায়তা করিতেছেন। গাভী প্রসব হইলে কিছুদিন পরে তাহার শাবকটীকে কসাইকে বিক্রয় করেন, এ দিকে দুগ্ধ দোহনের সময় বিচালী নির্ম্মিত একটী কৃত্রিম গোবৎস গাভীর সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে ভুলাইয়া দুগ্ধ দোহন করিয়া লয়েন। পুনশ্চ অধিক দুগ্ধ লাভের আশায় গাভীকে ফুকা দেন। আহা! ফুকা দেওয়া হেতু গাভীর সে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা পর্য্যবেক্ষণ করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। কিন্তু নির্ম্মম নরপিশাচ গোপগণ সে ভয়ানক লোমহর্ষণ কর্ম্ম করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয়েন না। সেই ফুকা দেওয়া বিষতুল্য দুগ্ধ পান করতঃ কত শিশু প্লীহা যকৃতাদিতে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইতেছে, কত রোগীর ব্যাধি গুরুতর বৃদ্ধি পাইয়া অসহ্য যন্ত্রণায় তাহাদিগের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বারংবার ফুকা দেওয়া হেতু এবং সমুচিত আহার অভাবে অচিরে কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া গাভী যখন দুগ্ধ দানে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়, তখন তাহাকে দুই এক মাস উপযুক্ত আহার করান হয়। পরে একটু হৃষ্ট পুষ্ট হইলে নৃশংস কসাইকে অধিক মূল্যে গোপগণ গাভীটি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। এইরূপে গোধনকুলের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানকালের গোপগণ আঢ্য হইবার

আশায় জগন্মাতা গৃহলক্ষ্মীদের ধ্বংসের সহায়তা করেন বটে, কিন্তু এই জঘন্ত পাপ ব্যবসা দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বিশেষ ধনবান্ হইতে পারিয়াছেন? যাঁহারা বা সামান্ত কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই কোন প্রকার অন্যায় অপ-ব্যয়ে সেই অর্থ নিঃশেষিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু পুরাকালের গোপগণ গো-রক্ষা করতঃ এত অর্থ সঞ্চয় করিতেন যে, তদ্দ্বারা এক একটী রাজত্ব স্থাপন করিতে পারিতেন। গোপরাজ নন্দঘোষ তাহার প্রমাণ স্থল। তিনি যত্ন সহকারে গোধন রক্ষা করত বিপুল অর্থ লাভ করিয়া গোকুলের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে গোপেরা তো প্রাণপণে গোধন রক্ষা করিতেনই; এতদ্ভিন্ন রাজা, মহারাজ, জমিদার, ইতর, ভদ্র, সর্ব্বসাধারণেই গো-পোষণ করিতেন। তাঁহারা গোধনের সম্মান ও মর্য্যাদা বুঝিয়াছিলেন এবং তন্নিমিত্ত ভগবতী বলিয়া গোধনের পূজা করিতেন। এমন কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং গোচর্য্যা ও গোচারণ করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে রাখালরাজ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরাকালের মহিলাগণ অপমান না ভাবিয়া স্বহস্তে গো-দোহন করিতেন, তন্নিমিত্তই কন্যাদিগের দুহিতা আখ্যার উৎপত্তি। পূর্ব্বে স্ত্রী-পুরুষের যত্নেই গো বংশের অত উন্নতি হইয়াছিল। সামান্ত ত্রুটি বশতঃ ও গোহত্যার গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত বিধান হইতে সহজেই ইহা অনুমান করা যায় যে, গোজাতিকে হিন্দুরা কিরূপ ভক্তির চক্ষে দেখিতেন এবং কত মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন। গো-জাতিকে প্রাণে মারিলেই গোবধ পাতক হইত না, সাবিত্রী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যম বলিয়াছিলেন,—

গোমাহারং প্রকুর্ব্বন্তং পিবন্তং যো নিবা-
রয়েৎ।
যাতি গো-বিপ্রয়োর্মধ্যে গোহত্যাঞ্চ
লভেত্তু সঃ॥
দণ্ডৈর্গাস্তাড়য়ন্ মূঢ়ো যো বিপ্রবৃষবাহকঃ।
দিনে দিনে গবাং হত্যাং লভতে নাত্র
সংশয়ঃ॥
দদাতি গোভ্য উচ্ছিষ্টং ভোজয়েদ্
বৃষবাহকম্।
ভোজয়েদ্ বৃষবাহারং স গোহত্যাং লভেদ্
ধ্রুবং॥

পূর্ব্বে রাজ্যধন লইয়া রাজায় রাজায় পরস্পরের মধ্যে যেমন যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইত, তদ্রূপ গোধনের নিমিত্তও ঘোরতর যুদ্ধ হইত। সেকালে যাঁহার সুন্দর সুলক্ষণাক্রান্ত ধেনু থাকিত, অন্তে ছলে বলে কৌশলে যে প্রকারেই হউক তাঁহার সেই পয়স্বিনীটী আপন আয়ত্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন। পুরাণে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বিরাট রাজার গোধন-হরণ তাহার একটী প্রমাণ। তখনকার লোকেরা অর্থের অপেক্ষা গোধনের মর্য্যাদা অত্যধিক জ্ঞান করিতেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র সমস্ত রাজ্য-ধনের বিনিময়ে বশিষ্ঠ মুনির সকাশে একটী গোধন বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। দেবোপম মুনিবর সেই বিপুল বিভব

প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বীয় সর্ব্বৈশ্বর্য্যরূপ গোধনটীকে কোনমতে মহারাজ বিশ্বামিত্রকে লইতে দেন নাই। আর আমরা এমনি কৃতঘ্ন যে, যিনি জন্মভূমির সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, যিনি তৃণাদি ভক্ষণ করতঃ গোমাতারূপে অতীব রক্ত-বল-বর্দ্ধক, মেধাশক্তিদায়ক নিজ স্তন্য-ক্ষীর-সুধা নিত্য আমাদিগকে পান করাইয়া, আমাদিগের জীবন রক্ষা করিতেছেন—যে দেবী ভগবতীর দুগ্ধ বিশ্বপ্রপঞ্চকের সকল প্রাণীর দুগ্ধাপেক্ষা সুমিষ্ট রুচিকর ও সুগন্ধ-বিশিষ্ট, যাঁর অস্থি, চর্ম্ম, চর্ব্বি, শোণিত, শৃঙ্গ, ক্ষুর এমন কি মলমূত্র পর্য্যন্তও মানবের মহোপকারী, সেই প্রাণদাত্রী জগন্মাতা গোলক্ষ্মীর রক্ষার্থে আমরা বিরত! ধেনুতে ভগবানের প্রত্যক্ষ বিভূতি বিদ্যমান বলিয়া ইনি আবহমান কাল হইতে ভগবতী আখ্যায় বিভূষিতা। ইহাকে আমরা কোন্ প্রাণে নিষ্ঠুর গোপদিগের দ্বারা নারকী কসাইয়ের হস্তে তুলিয়া দিতেছি? আসুন ভ্রাতাভগ্নীগণ! আমাদের পূজ্য আর্য্য পিতৃমাতৃগণের ন্যায় রূপময়ী জন্মভূমি লক্ষ্মী-স্বরূপা ধেনুকুলের রক্ষা জন্য প্রাণপণে যত্নবান্ হই।

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

কাব্য লেখা বিষয়ে মহাপণ্ডিত রাস্কিনের অভিপ্রায়।

রাসকিন্ (Ruskin) তাঁহার কোনও গ্রন্থে (Moderu Painter) লিখিয়াছেন যে, পড়িতে হইলে শ্রেষ্ঠ কবিতাই পড়া উচিত। মধ্যবিৎ রকমের কবিতা লইয়া বিব্রত হইবার আবশ্যক নাই। উত্তম কবিতার অভাব নাই বরং এত অধিক আছে যে, এক জীবনে তাহা পড়িয়া শেষ করা যায় না। নিম্নশ্রেণীর কবিতা প্রচার করিয়া পাঠককে কষ্ট দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। কোনও কোনও যুবা কবি মনে করেন যে, তাঁহাদের কাব্যে কিছু না কিছু ভাল আছে, ক্রমশঃ উন্নতি হইবে। যদি উন্নতির আশা থাকে, তবে এখন লোককে বিরক্ত করা কেন? এই সকল কবির প্রতি রাসকিনের কিছু মাত্র সহানুভূতি নাই। তিনি বলেন যে, সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও মনে করিলে কোনও কোনও ভাব কবিতাতে প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ লোক এরূপে সময় নষ্ট করিতে চাহেন না, আর যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কবিতা ভাল বাসেন ও কাব্যের ধাতু বুঝেন, তাঁহারা বেসুরে গাহিতে অনিচ্ছুক। ইহা ছাড়া নিম্ন শ্রেণীর কবিতা উচ্চশ্রেণীর কবিতার অনেক হানি করে।

কাব্যের সরসতা ও মাধুর্য্য বিলুপ্ত হয়, ভাল ভাবও নিকৃষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হয় ও পাঠকের অকারণ পরিশ্রম ও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। সচরাচর যে সকল ভাব সাধারণ লোকের মনে উদয় হয় প্রায় তাহার নূতনত্ব নাই, কারণ সেই সব ভাব পূর্ব্বে কোনও না কোনও উচ্চশ্রেণীর কবি উত্তমরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রাসকিন্ বলেন,—নিকৃষ্ট কবিতা না লিখিয়া উচ্চশ্রেণীর কবিগণ যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে সর্ব্বোত্তম স্থলগুলি যদি আমরা [illegible]ন করিয়া সাধারণ লোকের মন তাহাতে আকৃষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে যথার্থ উদারতা প্রকাশ করা হয় ও যথেষ্ট হিত সাধন হয়।

অধুনা আমাদের দেশে যে সকল কবিতা প্রকাশ হইতেছে, তাহার অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর। সংবাদ পত্রে ও মাসিক পত্রে এই সকল কবিতার ছড়া ছড়ি হইয়া পড়িতেছে। রচনার মাধুর্য্য কিম্বা রস, ভাবের নূতনত্ব বা বৈচিত্র কিছুই নাই এরূপ কবিতা যত কম প্রকাশ হয় ততই ভাল।

কি চিন্তায়, কি লেখায়, কি ব্যবহারে যতই উচ্চ আদর্শ অবলম্বিত হয়, ততই সমাজের মঙ্গল। অনেকে উচ্চ উচ্চ বিষয় লইয়া কাব্যাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হন বটে, কিন্তু নিজে সে সকল চরিত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম, গভীরতা ও প্রসার হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া উচ্চ আদর্শগুলিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলেন, কিন্তু ভাষার মাদকতায় সেগুলিকে এরূপ চিত্তাকর্ষক করেন, যে, অপরিণতবুদ্ধি সাধারণ পাঠকেরা তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

গৃহ-চিকিৎসা।

১। রক্ত আমাশয়ের ঔষধ। লাল নটেশাকের শিকড় ৵০ দুই আনা, এবং গোলমরীচ ৫ টা এক সঙ্গে বাটিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় আরোগ্য হয়।

২। বাধক বেদনার ঔষধ। কলমি শাকের রস এক ছটাক সেবন করিলে বাধক বেদনার উপকার হয়।

৩। পারদ সেবন ঘটিত শরীরে কোন প্রকার ফুস্কুড়ি প্রভৃতি হইলে আমরুল শাকের রস গায়ে মাখিলে বিশেষ উপকার দর্শে। হিঞ্চা শাকের রস ও মূলার রস এক সঙ্গে সেবন করিলে মূত্র পথে পারদ নিঃসারিত হয়।

৪। বাত বেদনার ঔষধ। যে কোন স্থানে বাত বেদনা হইলে বুড়ি গোপানের রস, প্রদীপের তৈল ও কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ এক সঙ্গে মিলাইয়া মালিস করিলে অচিরে বেদনা নিবারণ হয়।

৫। পারদ বিকারের কিম্বা বাতরক্তের ঔষধ। এক তোলা বিশুদ্ধ গন্ধক এক সের দুগ্ধে জ্বাল দিয়া ডেলা ক্ষীরের মত করিয়া একুশটী বটিকা করিবে। প্রত্যহ

তিন বেলা এক একটী বটিকা সেবন করিলে পারদ-দোষ ও বাত-রক্ত আরোগ্য হয়। এরূপ তিন সপ্তাহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবন কালীন ঘৃতসৈন্ধবের পাকে নিরামিষ আহার করিতে হইবে।

৬। অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী রোগের ঔষধ। অশ্মরী রোগ হইলে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা হইলে কুলথ কলাই (কুলথী কড়াই) ও সজিনার ছাল উভয় এক তোলা করিয়া ঐ মিলিত দুই তোলা আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া উহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৭। মসিনা (তিসী) দুই তোলা এক পোয়া জলে চায়ের মত প্রস্তুত করিয়া খাইলে মূত্র-রোধ ও জ্বালা নিবারণ হয়।

নূতন সংবাদ।

১। স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ গত ২১ শে মার্চ্চ ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া পরলোকগত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন।

২। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ এস্ পি সিংহ স্থায়িভাবে বঙ্গের এডভোকেট জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই স্থায়ী পদলাভ বাঙ্গালীর পক্ষে এই প্রথম।

৩। ১৮ ই ও ১৯ শে এপ্রিল ময়মনসিংহে মুসলমান প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হইবে।

৪। সম্প্রতি বরোদার মহারাজা তাঁহার রাজ্যে মূকবধিরদিগের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপনোদ্দেশে কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ে দুইটী লোককে শিক্ষা প্রণালী অবগত হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। মূকবধির শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত প্রার্থনীয়।

৫। চিন গবর্ণমেণ্ট স্বীয় রাজ্যে যাহাতে কেহ আফিমের নেশা করিতে না পারে এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন, এবং ইংরাজরাজকেও তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্যে চিন অধিবাসীরা যাহাতে আফিমের নেশা করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন।

৬। ভাগলপুর জেলা স্কুলের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামজী শর্ম্মা কাব্যতীর্থ মহাশয়, যিনি বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকে এক হাজার টাকা পারিতোষিক দান করিবেন, ঘোষণা করিয়াছেন।

৭। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী সার হেন্‌রী ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান্ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর-

গ্রহণ করিতেছেন। শুনা যায় মিঃ এস্‌ কুইথ্ তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

৮। গত ১৮ ই মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা ফেডেরেশন্ হলে শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পালের অভ্যর্থনার জন্ম এক বিরাট সভা হয়। সভায় প্রায় পাঁচ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া পাল মহাশয়কে দেওয়া হয়।

৯। সম্প্রতি কোন সম্ভ্রান্ত পাদ্রি ওভাংটুন হলে বক্তৃতা কালে বলেন, —আমরা যখন বিলাত হইতে ভারতে মিসনের কার্য্যে আগমন করি তখন আমাদের মনে এই কথাই জাগরূক থাকা উচিত যে, আমরা একটী প্রাচীন-জ্ঞানোন্নত ধর্ম্মপ্রাণ জাতির নিকট যাইতেছি। এই মহাজাতি সেই প্রাচীন জ্ঞান-ধর্ম্মের গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

বামারচনা।

কাশী

(১)
কোথা কাশী বারাণসী পুণ্য তীর্থ ধাম?
যথা হর বিশ্বম্ভর, বিরাজিত বিশ্বেশ্বর,
মম চিত্ত তথা যেতে চাহে অবিরাম।

(২)
যে মানব কাশী মাঝে হেরে বিশ্বেশ্বরে,
জীব ভাব গিয়ে তার, হয় শিব ভাব সার,
পার্থিব সংসার চিন্তা থাকে না অন্তরে।

(৩)
কাশী তীর্থে বিশ্বনাথে নেহারিব কবে?
পেতে তাঁর দরশন, সতত ব্যাকুল মন,
দেবাদিদেবের দেখা কবে ভাগ্যে হবে?

(৪)
কাশী গিয়া বিশ্বনাথে করিলে দর্শন,
তবেই কি মুক্তি হয়, নতুবা কিছুই নয়,
তাই কি সে কাশী যেতে চাহে প্রাণমন?

(৫)
পাপী আমি জ্ঞানহীনা মোহান্ধ ললনা,
তাই ভাবি কাশী গিয়ে, বিশ্বেশ্বরে নেহারিয়ে,
হবে মোর মহা মুক্তি পুরিবে কামনা।

(৬)
বুঝিনা আমারি দেহ তীর্থ কাশী ধাম,
অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময়,
পূত সে বিজ্ঞানময় পঞ্চকোষ নাম।

(৭)
স্বচ্ছ জ্ঞানধারা আদি গঙ্গা প্রবাহিত।
শান্তিময় পূত চিত্ত, সে মণিকর্ণিকা তীর্থ,
নিত্যজ্ঞান সুখানন্দ তথা বিরাজিত।

(৮)
শিবানী ভবানী বুদ্ধি আত্মা সে ভৈরব,
নিতাই অদ্বৈত রূপ, পাপ পুণ্য সাক্ষী রূপ;
বিরাজিত দেহ মাঝে অযোনিসম্ভব।

(৯)
আমারি এ দেহ কাশী করিয়া নির্ম্মাণ,
বিশ্বেশ্বর বিশ্বপ্রাণ, করিছেন অধিষ্ঠান,
মোহাচ্ছন্ন ভ্রান্ত আমি তাঁরে ভাবি আন।

(১০)
তিনি আমি ভিন্ন নই পারিনা বুঝিতে,
জ্ঞানহীনা তাঁরে তাই, ভেদ ভাবি সর্ব্বদাই,
ব্যষ্টি মাঝে সমষ্টিকে পাইনা দেখিতে।

(১১)

নিরখিলে দেহ মাঝে দেব বিশ্বনাথ,
হবেনা জনম আর, লয় পাব পদে তাঁর,
ব্যষ্টি মোর মিশে যাবে সমষ্টির সাথ।

(১২)

যেতে চাহি বিশ্বনাথে হেরিতে কাশীতে
কবে দেহ-কাশী মাঝে নেহারিব বিশ্বরাজে,
ঐহিক বাসনা ত্যজি নিত্যানন্দ চিতে?

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

অশ্রুধারা

জাহ্নবীর তীর।

প্রথম সর্গ।

শান্তির ক্রোড়েতে সুপ্ত ধরণী সুন্দরী,
উপরে অনন্ত নীল চন্দ্রাতপ শোভে,
প্রস্ফুটিত অগনণ তারামালা তায়,
পৌর্ণমাসী পূর্ণচন্দ্র অমল ধবল,
ঢালিছে জোছনা-রাশি ধরণী-অঙ্গেতে
দিগন্ত নীরব—
জননীর অঙ্কে যথা সুপ্ত নব শিশু;
এ হেন নিশিতে, কাহার ক্রন্দন,
ওই পশিছে শ্রবণে?
সংসার গরল পানে কোন হতভাগা
আমা সম বুঝি কাঁদে নির্জ্জনে বসিয়া?
কিম্বা কোন পুত্র শোকাতুরা!
প্রাণের পুত্তলিরত্ন—আশার মুকুল,
ঝরিয়াছে শূন্য করি হৃদি-বৃন্ত তার,—
অকালে, করাল কালে
পুত্র-রত্ন করি সমর্পণ,
তুলিয়াছে এ নিশায় মর্ম্মভেদী রোল?
না! বুঝি কোন হিন্দুর বিধবা!—
নির্জ্জন এ নিশি, ঊর্দ্ধে নীল নভো,
নিম্নে নীলিমা-সাগর,
স্তব্ধ দশদিশি,
অনন্ত জগত কোটি কোটি প্রাণী
সবে শান্তিতে মগন, সে শান্তিতে
বিধবা না হ'লে—
কোথা আর জলে তবে অশান্তি-অনল?
হরি বল! হরি বল!—
এরূপেতে বিধবা কাঁদে না?
ধরিত্রী জিনিয়া ধৈর্য্য,
গভীর বারিধি সম গম্ভীর সে হৃদি,
হাসি মুখে বেদনা লুকায়,
নিভৃত নির্জ্জনে ঢালে তপ্ত অশ্রুধারা
জগতের কেহ তা জানেনা।
হায়! আমি কি বাতুল!
এ যে পরিচিত ত্রিদিব-সঙ্গীত—
মাতা জাহ্নবীর গীত?
মরি মরি কিবা অমিয় মাখান গান!
মাগো এই কি গো স্বরগীয় সুর?
ত্রিদিব নিবাসিগণে এইরূপে গায়?
হায়, কেমনে বাখানি
কি সুধা ঢালিছ বামা জগত-শ্রবণে!
কিন্তু একি শুনি?
শোকোচ্ছ্বাস—মর্ম্মভেদী ভাব,
কত যেন বেদনা মাখান সুরে।
দেবলোক-নিবাসিনী তুমি দেববালা,
কি জ্বালা মা তোর?
অভাগা নরের মত

কি বিষাদে কাঁদিছ গো ধরায় ফিরিয়া?
তবে কিমা স্বরগেও জ্বালা আছে।
ত্রিদিবনিবাসিগণও কাঁদে
তবে আমাদের মত?
মিলেছে গো ভাল!
আমিও কাঙ্গাল মাগো তুইও কাঙ্গালী,
মায়ে পোয়ে চল জুড়াইগে
পশি কোন নিভৃত গহনে, কিম্বা কোন
সুদূর প্রদেশে, যথা না প্রবেশে
কভু সংসারের গোল।
হেন দেশে সঙ্গে করি নেযাইবে মোরে?
আমি তোর কাঙ্গাল সন্তান,—
বল-না-মা!—নেযাবে না মোরে?
বুঝে'ছি! কি আর বলিব,
পূর্ণ কর বাসনা তোমার,
কিন্তু মিনতি আমার!—
জীবন-গগনে যবে গোধূলি ছাইবে,
ঘোর মসীময় হেরিব চৌদিক্ বেড়ি
আঁধারে ডুবিলে পরে আয়ু সূর্য্য মোর,
তুলে নি'ও কোলে গো জননি! (ক্রমশঃ)।

১৩১৪ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

২। নারীচরিত ও নারী জাতির সৎকীর্ত্তি।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীহরকুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।